অনাথ বালক।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস।)

"চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতাকৃষিঃ।
ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে॥"

HARE PRESS: CALCUTTA

1891.

মূল্য ৸০ বার আনা।

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
23/1, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

উৎসর্গ।

অশেষগুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র

দীনজনপ্রতিপালকেষু।

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

কুমার,

দরিদ্র-দুঃখদ্বেষিণী দয়াপ্রবৃত্তির সহিত যাঁহাদের দানোপযোগী অর্থ আছে, জগতে তাদৃশ ভাগ্যবান লোকের সংখ্যা অতি অল্প। আপনি যে সেই শ্রেণীর, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অসহায়কে অন্নদান, ব্যাধিতকে ঔষধ বিতরণ আপনার বাড়ীতে নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। অনাথ বালকের উপযুক্ত আশ্রয়ই আপনি।

পুস্তকখানির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটী—এক দরিদ্রের প্রতি ধনীর সহানুভূতি আকর্ষণ, আর আদর্শ হিন্দু বিধবার চরিত্র প্রদর্শন। দু'টী উদ্দেশ্যই আপনার ভাল লাগিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস; এবং এই বিশ্বাসের বলেই "অনাথ বালক" আপনার করে অর্পণ করিতে আমার সঙ্কোচ নাই।

উপসংহারে প্রার্থনা এই যে, আপনার অতুল বিভব কমলার কৃপায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আর আপনি সৎকার্য্যে মুক্তহস্ত হইয়া শান্তিময় দীর্ঘজীবন উপভোগ করুন।

হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ

তমোলুক,

শ্রী—গ্রন্থকারস্য।

১৮ই শ্রাবণ, শকাব্দাঃ ১৮১৩।

অনাথ বালক।

প্রথম অধ্যায়।

ফতেপুর।

নিম্ন বঙ্গের কোন জেলায় ফতেপুর গ্রাম। গ্রামের পূর্ব্ব দিয়া অনতিদূরে দক্ষিণাভিমুখিনী এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। তাহাতে জোয়ার ভাঁটা খেলে না; সুতরাং জল লবণাক্ত নহে, কিন্তু মিষ্ট এবং পানীয়। গ্রামটী নদীর সহিত সমান্তরাল ভাবে উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত; এবং দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ ক্রোশের উপর। লোকের বাড়ীগুলি সমস্তই সমসূত্রে, সম্মুখে নদী, এবং পশ্চাতে প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্রাদি। নদী ও গ্রামের মধ্যে অল্পবিস্তার একটী মাঠ; তাহার উপর দিয়া উত্তরদক্ষিণমুখী দুইটী পথ।

একটী গ্রামের ধার দিয়া, অপরটী নদীতীরে। এই দুই পথে
ব্যবচ্ছেদ করিয়া এক এক ক্ষুদ্রবর্ত্ম গৃহস্থের বাড়ী হইতে ন
তটে গিয়া মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটী পথ অপেক্ষায়
প্রশস্ত, এবং সেই গুলি গ্রামভেদ করিয়া পশ্চিমপার্শ্বস্থ প্রান্ত
প্রবেশ করিয়াছে।

গ্রামটী অতি প্রাচীন না হইলেও আধুনিক নহে। ন
শুনিলেই অনুমান হয় যে মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে ই
স্থাপিত হইয়াছিল। আর এরূপ নির্দ্দেশ করাও অসঙ্গত ন
যে, যেখানে নদীর ধারে এমন সুশৃঙ্খলার বসতি, তাহা অনে
দিন পূর্ব্ব হইতেই আছে। ক্রমে লোক সংখ্যা অধিক হওয়
নদী হইতে দূরে নূতন গ্রাম সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফত
পুরে কোন প্রাচীন মন্দির বা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ নাই
তবে মধ্যে মধ্যে নদীতটে যে দুএকটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে
তাহা স্থানটীর প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। গ্রাম সম্বন্ধে উল্লেখযো
কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা বস্তু কিছুই নাই। ডাক্তার হাণ্ট
সাহেব তৎকৃত বাঙ্গালার বিবরণী পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এ
গ্রামটী উৎকৃষ্ট তণ্ডুলের জন্য প্রসিদ্ধ। আমরা কিন্তু এই উৎক
কখনও অনুভব করিতে পারি নাই; এবং ইহাও আমাদে
বিশ্বাস যে ফতেপুরে যেমন তণ্ডুল জন্মে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূ
উৎপন্ন তণ্ডুল তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

এই ফতেপুরে প্রায় দেড়শত ঘর লোকের বাস। তন্মধ্যে
তিনঘর ব্রাহ্মণ, পাঁচঘর কায়স্থ; এ ছাড়া স্বর্ণকার, সূত্রধা
কুম্ভকার, ধীবর, নাপিত, রজক প্রভৃতি সকলই দুএক
আছে। ইহারাই হিন্দু; বাকি সমস্তই মুসলমান। গ্রামে

উত্তর ধারে সমস্ত হিন্দুর বাস, দক্ষিণ দিকে মুসলমানের বসতি। সমৃদ্ধিশালী লোকের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও সকলেরই অবস্থা সচ্ছল বলা যাইতে পারে। পরের অধ্যায়ে আমরা যে সময়ের কথা আরম্ভ করিব তখন গ্রামটী অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্যোতিঃ বা আধুনিক বিলাসিতার ভাতি বিন্দুমাত্রও গ্রামে প্রবেশ করে নাই। গ্রামের পনের আনা উনিশ গণ্ডা লোক তখন একটী ঘড়ির বাজনা শুনিলে হা করিয়া থাকিত, এবং ধর্ম্ম না হইলে আর কিসে এমন সময় বুঝিয়া এক, দুই, তিন বাজাইবে ভাবিয়া উহাকে ধর্ম্মঘড়ি বলিত। কাচের বাসন, কাপড়ের ছাতা, কলিকাতার জুতা কেবল বড় মানুষেই ব্যবহার করে এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল। অন্যপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মেডিকাল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণাধাত্রী না থাকিলেও এই ক্ষুদ্র পল্লীর স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই নিরাপদে সন্তান প্রসব করিত। আধুনিক সমাজের নাসিকাকুঞ্চন এবং বমনোত্তেজক ক্ষুদ্র আর্দ্র গৃহে থাকিয়াও সেক তাপ খাইয়া সেই সব সন্তান বাঁচিয়া থাকিত। আরারুট, বার্‌লি প্রভৃতি কত কি মাথামুণ্ড চক্ষে না দেখিলেও মাতৃস্তন্য এবং গোদুগ্ধ পান করিয়াই তাহারা বেশ বর্দ্ধিত হইত। ক্রমে মোটা চাউলের ভাত এবং নদীর কর্দ্দমাক্ত জল উদরে পূরিয়াও তাহারা সর্ব্বদা উদরাময়ে ভুগিত না। শতচ্ছিদ্রময় বেড়া পরিবেষ্টিত চালা ঘরে থাকিয়াও তাহাদিগকে হিম লাগিত না। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য শৈলাবাসে না গিয়াও অনেক সময়ে তাহারা আরোগ্য লাভ করিত।

গ্রামের ভদ্রলোক বলিলে কয়ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ এবং দু চারি

ঘর মুসলমানও বুঝা যাইত। অন্যের সহিত ইহাদের প্রভেদ এই যে,এই সমস্ত পরিবারের পুরুষেরা তখনকার দিনের সামান্য লেখা পড়া জানিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে বাহির হইতেন। তখন লেখাপড়া বলিলে পল্লী-গ্রামে বাঙ্গালা লেখাপড়া এবং তৎসঙ্গে একটু পারসীও বুঝা যাইত, কিন্তু ইংরেজীর চলনই হয় নাই। বাঙ্গালা লেখাপড়ার সহিত পুস্তকের কোন সম্বন্ধই ছিল না। এক এক জন গুরুর উপদেশে প্রথমতঃ তালপত্রে "সিদ্ধিরস্তু" অ, আ প্রভৃতি বর্ণমালা আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ফলা বানান সারিয়া, হস্তাক্ষরের পরিপক্কতা অনুসারে কদলীপত্রে এবং শেষে মোটা কাগজে পত্রাদি লেখা চলিত। গণিতে শুভঙ্করের আর্য্যা, আর উচ্চ সাহিত্যে চাণক্যের সংস্কৃত শ্লোক তখন শিক্ষার বিষয় ছিল।

আর দুএকটী কথা বলিলেই গ্রাম সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত বলা হয়। ফতেপুরে হাট কিম্বা বাজার বসে না। তবে উত্তর দিকে অর্দ্ধক্রোশের মধ্যেই একটী ক্ষুদ্র বাজার আছে। তথায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সামান্য মাছতরকারি, পান, সুপারি, দুদ ইত্যাদি পাওয়া যায়। নদীর অপর পারে গ্রামের সম্মুখেই শ্যামগঞ্জে সপ্তাহে দুইবার করিয়া এক প্রকাণ্ড হাট বসে। সেখানে সমস্ত জিনিসই উঠে। ফতেপুরের লোকেরা এই হাট হইতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুই ভাই—কালাচাঁদ ও গোরাচাঁদ।

"সৌভ্রাত্রমেষাং হি কুলানুসারি।"

এই ফতেপুরে কালাচাঁদ মিত্রের বাড়ী। কালাচাঁদ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন সম্পন্ন লোক বলিয়া গণ্য, কেন না গ্রামে তেমন বড় লোক নাই। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ মুসলমান অপেক্ষা উচ্চবর্ণের হিন্দুর মান অধিক। কালাচাঁদ কুলীনকায়স্থসন্তান, তাহাতে আবার তখনকার দিনের একটী বড় চাকরী করিতেন। কালাচাঁদ উত্তর অঞ্চলে এক জমিদারের কাচারির নায়েব ছিলেন। গ্রামে যে কালাচাঁদের সম্মান ছিল ইহা বলাই বাহুল্য। লেখা পড়ায় তাঁহার সমকক্ষ লোক ফতেপুরে ছিল না। পারস্য ভাষা উত্তমরূপ জানিতেন বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে কালাচাঁদ মুন্সী বলিয়া ডাকিত।

কালাচাঁদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার নাম গোরাচাঁদ। গোরাচাঁদ তাদৃশ লেখাপড়া জানিতেন না ; কিন্তু জ্যেষ্ঠ কালাচাঁদই তজ্জন্য অনেকাংশে দায়ী। যখন তাঁহাদের মাতা পিতা উভয়েরই কাল হয়, তখন গোরাচাঁদ শিশু, কালাচাঁদ প্রায় কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন। কালাচাঁদ অতি যত্নে গোরাচাঁদকে মানুষ করেন। তখন ইঁহাদের অবস্থা তত ভাল ছিল না। বাড়ীতে অন্য অভিভাবক না থাকায় কালাচাঁদই গোরাচাঁদের পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। যাহাকে হাতে পিঠে করিয়া মানুষ করা বলে কালাচাঁদ সেইভাবে গোরাচাঁদকে লালন পালন করিয়াছিলেন। স্নেহাধিক্যবশতঃ কখনও তাহাকে উঁচু কথাটী কহেন নাই। সুতরাং আদর পাইয়া গোরাচাঁদের লেখাপড়ার প্রতি তেমন মনই ছিল না। এসম্বন্ধে অন্য কেহ কিছু তাড়না বা অনুযোগ করিলে কালাচাঁদ বলিতেন "ও আমার বেঁচে থাকুক, লেখাপড়া বেশী নাই শিখিল।" গোরাচাঁদ একটু রৌদ্রে হাঁটিয়া গেলে কালাচাঁদের চক্ষে বেদনা বোধ হইত। সাধ্যমত কখনও তাহাকে কোন কার্য্য করিতে দেন নাই। বাড়ীতে চাকর না থাকিলে অভ্যাগত ভদ্রলোককে কালাচাঁদ নিজে তামাক সাজিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু গোরাচাঁদকে কখনও কলিকাটী স্পর্শ করিতে দিতেন না। গোরাচাঁদেরও স্বভাবে অন্য বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিলেও অগ্রজের প্রতি ভক্তি অচলা ছিল। কালাচাঁদের পায়ে একটী কাঁটা ফুটিলে গোরাচাঁদের তাহা দাঁত দিয়া বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা হইত। কালাচাঁদের প্রতি কাহারও বিদ্বেষ আছে এ কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও গোরাচাঁদ তাহাকে চিরশত্রু মনে করিতেন। ফলতঃ

তিনি ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ ছিলেন। তাঁহার স্বভাবে অন্যান্য সদ্‌গুণেরও অভাব ছিল না। তবে বিদ্যা না থাকিলে প্রায়ই বিনয়শিক্ষা হয় না। গোরাচাঁদ একটু উদ্ধত স্বভাবের লোক ছিলেন। লোকে তাঁহাকে অনেক সময়ে গোঁয়ার গোরাচাঁদ বলিত। কেহ কেহ উপহাসচ্ছলে গোঁয়ার গোবিন্দ বলিতেও ক্রটী করিত না। কিন্তু তাঁহার এই স্বভাবের গুণে কালাচাঁদের কিছু লাভই ছিল। কালাচাঁদ ভাল মানুষ বলিয়া বিখ্যাত; লোকে গোরাচাঁদকে একটু ভয় করিত। গোরাচাঁদের অপরিমিত সাহস ছিল। কালাচাঁদ বৎসরের এগার মাস কর্ম্মস্থলেই যাপন করিতেন; গোরাচাঁদ বার মাস বাড়ীতেই থাকিতেন।

কালাচাঁদের বিবাহ তাঁহার পিতা মাতা জীবিত থাকিতে অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। গোরাচাঁদের বয়স যখন নয়দশ বৎসর তখন কালাচাঁদকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে বাহির হইতে হয়। গৃহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি গোরাচাঁদের বিবাহ দেন। কালাচাঁদের স্ত্রী গোরাচাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন; সুতরাং কালাচাঁদের বিদেশ গমন কালে সংসারের ভার তাঁহারই উপর পড়ে। কালাচাঁদের স্ত্রী লক্ষ্মী- স্বরূপা ছিলেন। তাঁহার স্বভাব সদ্‌গুণের আধার ছিল। স্বামী চলিয়া গেলে পাছে দেবরের সমুচিত যত্ন না হয় এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা যেন শঙ্কিতা থাকিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত যে তিনি গোরাচাঁদের যে যত্ন করেন, কালাচাঁদ থাকিলে তদপেক্ষা অধিক করিতেন। গোরাচাঁদেরও অগ্রজের প্রতি যেমন ভক্তি, ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না। গোরাচাঁদের

স্বভাবের গুণই এই ছিল যে বাহিরে গোঁয়ার গোবিন্দ হইলেও বাড়ীতে তিনি অতিশয় বিনীত ছিলেন।

ক্রমে গোরাচাঁদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদের স্ত্রী সাংসারিক কার্য্যভার একে একে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইচ্ছা যে নিজে অবসর লইবেন। তখন পল্লী-গ্রামের সাধারণ নিয়মই এই ছিল যে বাড়ীতে বয়ঃপ্রাপ্ত কার্য্যক্ষম পুরুষ থাকিলে কর্ত্তৃত্বভার কখনও স্ত্রীলোকের উপর থাকিত না। অনায়ক, স্ত্রীনায়ক, শিশুনায়ক সংসার কখনই সুচারুরূপে চলে না, ইহাই সেকালের বাঙ্গালীর ধারণা ছিল। অধুনা ইংরাজী শিক্ষার গুণে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এ প্রতীতি তিরোহিত হইয়াছে। প্রাচীন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পরিবারের মধ্যে যিনি উপার্জ্জনশীল, তাঁহার গৃহিণী বিদ্যমান থাকিতে পয়সাকড়ি অন্যের হাতে থাকিবে আজিকালি ইহা ত এক অসামাজিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কথা বলা বাহুল্য যে এখন আমাদের সা[illegible]কের সে নিঃস্বার্থভাবপূর্ণ পারিবারিক বন্ধন আর নাই। সোদর অক্ষম হইলে ভাগ্যবান ভ্রাতা তাঁহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবেন এ কথা হাল সভ্যতার আইনে লেখে না। তবে বিশেষ বিবেচনাস্থলে এরূপ দুর্ভাগা ব্যক্তি যদি কার্য্যতঃ দাসভাবে পরিবারে মিশিয়া থাকিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিবারকেও রাখিতে নিষেধ নাই। কিন্তু তিনি যদি আপনাকে কর্ত্তার এক রক্তের ভাই বলিয়া স্বপ্নেও ভাবেন, অথবা তাঁহার স্ত্রীর সামান্য পরিচ্ছদ কিন্তু ভ্রাতৃজায়া নানালঙ্কারভূষিতা বলিয়া তাঁহার চক্ষু টাটায় তাহা হইলে সে ত একবারেই অসহ্য। পরন্তু কার্য্যবিশেষে যদি

ংকর্ত্তৃক ভ্রাতৃজায়ার কোনরূপ অসন্তোষের উদ্রেক হয় তাহা হইলে ভদ্রাসন হইতে বহিষ্করণ ভিন্ন অন্য ব্যবস্থাই নাই। অসভ্য কালাচাঁদ বা তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহিণীর মনে কখনও এরূপ বিবেকের উদয় হয় নাই। মা'র পেটের ভাইকে আবার ফেলা যায় কালাচাঁদের এরূপ ধারণাই ছিল না। নিজে যাহা খাইব ভাই তাহাই খাইবে, নিজের স্ত্রী যাহা পরিবে ভ্রাতৃবধূও তাহাই পরিবে তাঁহার মোটা বুদ্ধিতে ইহাই আসিত। কালাচাঁদের স্ত্রীও স্বামীর মনের ভাব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; এবং তাঁহার নিজের মনও অমার্জ্জিত হইলেও অতি পবিত্র ছিল। শৈশবে পিতার নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন যে, যে রমণী স্বামিগৃহে গিয়া কোন আত্মীয়ের সহিত স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটায় সে গৃহিণীই নহে। জনকের এই উপদেশ কন্যার মনে আজীবন বদ্ধমূল ছিল; এবং পতিগৃহে আসিয়া অবধি তিনি মূর্ত্তিমতী শান্তির ন্যায় বিরাজ করিতেন। গোরাচাঁদের সাংসারিক জ্ঞান জন্মিলেই তাঁহাকে কর্ত্তা করিবেন ইহা তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গোরাচাঁদ এ ভার গ্রহণে লোলুপ ছিলেন না। যখন যাহা আবশ্যক হইত তিনি তখনই তাহা পাইতেন, অথচ সংসারের ঝঞ্ঝাট কিছুই পোহাইতে হইত না। এরূপ থাকিতে পারিলে কে কর্ত্তা হইতে চায়? ভ্রাতৃজায়া আগ্রহ প্রকাশ করিলেই গোরাচাঁদ বলিতেন কাজকর্ম্ম যাহা দেখিতে হয় বলিবেন, আমি দেখিব; টাকা কড়ি আপনার হাতেই থাকুক। কালাচাঁদের স্ত্রীর ইহাতে মন উঠিত না। তিনি সম্পূর্ণরূপে অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। কালাচাঁদের স্ত্রীর প্রথম গর্ভের

সঞ্চার হইয়াছে। আসন্নপ্রসবা হইয়াই তিনি দেবরকে বুঝাইয়া দিলেন যে কিয়ৎকাল পরেই তাঁহাকে সন্তান পালনে নিযুক্তা হইতে হইবে। তৎসঙ্গে সংসারের ভার কিছুমাত্র থাকিলেও তাঁহার কষ্ট হইবে। গোরাচাঁদ যেন হৃষ্টমনে কেবল ভ্রাতৃজায়ার সাহায্যার্থেই এই ভার গ্রহণ করিলেন।

ফলতঃ কালাচাঁদের এই ক্ষুদ্র ভবন এক ক্ষুদ্র স্বর্গ ছিল। ইহাতে অশান্তির বায়ু কখনও প্রবাহিত হয় নাই। দ্বেষবহ্নি কখনও প্রজ্বলিত হয় নাই। কলহের ত বীজমাত্রও ছিল না। প্রীতি, ভালবাসা এবং সন্তোষ যাহা মানবজীবনের অতুল ঐশ্বর্য্য তাহা এই পরিবার মধ্যে প্রচুর ছিল। গোরাচাঁদ যখন ছোট ছিলেন, তখন কোন অন্যায় কার্য্য করিলে কালাচাঁদের স্ত্রী নিজে কিছু না বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেন যে তাহার দাদা বাড়ী আসিলে বলিয়া দিবেন। আবার ভ্রাতৃজায়া গোরাচাঁদের শৈশববুদ্ধির অনভিপ্রেত কোন কার্য্য করিলে তিনি শাসাইয়া রাখিতেন যে, পূজার সময়ে তাঁহার নামে নালিস হইবে। বৎসরান্তে কালাচাঁদ বাড়ী আসিলে গোরাচাঁদই তাঁহার আরজী প্রথম পেশ করিতেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে কালাচাঁদের স্ত্রীর দরখাস্তেই অনেক সঙ্গত কারণ থাকিত। কালাচাঁদ সাধারণতঃ একটু মিষ্ট হাসিয়াই প্রায় উভয়ের সমস্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতেন। আবশ্যকস্থলে গোরাচাঁদকে বলিতেন "তোমার এ করা ভাল হয় নাই।" গোরাচাঁদ প্রাণান্তেও আর কখনও সেকাজ করিতেন না। এখন গোরাচাঁদের সে ভাব চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞান হওয়া অবধি তিনি কালাচাঁদের স্ত্রীকে জননীর ন্যায়

দেখিতেন। সাবেক নালিশের কথা মনে হইলে এখন তাঁহার বড়ই লজ্জা হয়।

এ অধ্যায় ইহাই বলিয়া শেষ করিব যে প্রথম গর্ভে কালাচাঁদের স্ত্রী এক কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। আর একটী কথা, এতবার যে কালাচাঁদের স্ত্রীর কথা বলিলাম তাহার নামটী কি পাঠককে বলিয়া দেওয়া হয় নাই। কালাচাঁদের স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী।



তৃতীয় অধ্যায়।

কালাচাঁদের সংসার।

"উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

পাঠক হয় ত এতক্ষণে চটিয়া উঠিয়াছেন। মনে মনে গ্রন্থ-কারকে বলিতেছেন "তোমার স্বর্গ লইয়া তুমিই থাক। যে স্বর্গে কালাচাঁদ আর গোরাচাঁদ সে স্বর্গের আর বর্ণনায় কাজ নাই। ভাল পুরুষের নামই না হয় কালাচাঁদ গোরাচাঁদ হইল, স্ত্রীলোকের নাম লক্ষ্মী রাখিলে কোন হিসাবে? তুমি বই যা লিখিবে তা এই হাড়জ্বালান নামেই প্রকাশ।" বাস্তবিকই নামগুলি অতি কদর্য্য হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে এরূপ নাম অগ্রাহ্য। আমরা কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, যেখানে নাম শুনিবেন জগন্নাথ, বৃন্দাবনচন্দ্র, কালীকিঙ্কর বা ভবানীপ্রসাদ সেখানেই জানিবেন যে, হয় তাঁরা অষ্টাদশ

শতাব্দীর বকেয়া মূর্খ, না হয় উনবিংশ শতাব্দীর ভূতপ্রেত। এরূপ নামের ছেলে ত বর্ত্তমান সময়ে হইতেই পারে না; অথবা যদিও হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাহারা কখনই উত্তীর্ণ হইবে না। স্ত্রীলোকের নাম লক্ষ্মী হইলে সে ত নিশ্চয়ই ছেলে বেলায় কুড়াইয়া পাওয়া মেয়ে। হাল আইনে নাম হইবে পুরুষের, যথা—অজেন্দ্র, গজেন্দ্র, বৃষভকান্তি, গর্দ্দভভ্রান্তি ইত্যাদি। আর স্ত্রীলোকের অতি কোমল এবং মসৃণ অর্থাৎ যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে স্পর্শ করিলে কোনও মতে উচ্চনীচ বোধ হয় না, যথা—কুভাষিণী, সুনাশিনী ইত্যাদি। আমাদের অদৃষ্টের ফের; এমন নাম আমরা কোথায় পাইব? সেই সাবেক পচা দুর্গন্ধময় নাম লইয়াই আমাদের কারবার। তখন বৃদ্ধা গৃহিণীরা অথবা গুরু পুরোহিত নাম রাখিতেন। নামের জন্যে নাটক নবেল খোঁজা হইত না। স্বসম্পর্কীয় কাহারও নামে না বাধে এইরূপ দেখিয়া তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া অর্থযুক্ত ঠাকুরের নামই প্রায় রাখিতেন। এরূপ নামের লোক এখনও একবারে বিরল হয় নাই। গুরুদাস, দুর্গাচরণ, প্যারিমোহন, প্রভৃতি নাম এখনও সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন, রাধাকান্ত, শম্ভুনাথ, দ্বারকানাথ, মধুসূদন, প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু, দিগম্বর, জয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি নাম আজিও বাঙ্গালার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র সমগ্র দেশ কাঁদাইয়া ত কালি গিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এখনও হরিদাস, অযোধ্যানাথ, হনুমান-সহায় প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় আজি কালি অজেন্দ্র গজেন্দ্রদিগের আমল পড়িয়াছে। বুড়ো-

বাপের বে-আদুবীতে কাহারও ভাগ্যে খারাপ নাম হইয়া থাকিলে জ্ঞান হওয়ামাত্রই সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা বদলাইয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আর বাড়াইব না। পাঠক হয় ত কৈফিয়ত পড়িয়াই আরও চটিতেছেন। একটী ভাল নাম আছে। তাহা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহির করা হয় নাই। সে গোরাচাঁদের স্ত্রীর। তাঁহার নাম জ্ঞানদা।

কালাচাঁদের কন্যাটীর নাম হইয়াছে মোক্ষদা। মোক্ষদার জন্মের পর তিন বৎসর না যাইতেই কালাচাঁদের স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সংবাদ পাইবার কিছুদিন পরেই পূজার সময়ে কালাচাঁদ বাড়ী আসিলেন। কালাচাঁদের নিয়ম ছিল পূজার সময়ে কর্ম্মস্থল হইতে যাহা পারিতেন দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে করিয়া আনিতেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎসর যেরূপ আনেন এবার তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আনীত হইল। কালাচাঁদ গোরাচাঁদ লক্ষ্মীর মনে অপার আনন্দ। কবে পূজা আসিবে, সন্তানের মুখ দেখিব, এই সুখের আশায় কালাচাঁদ উদগ্রীব হইয়াছিলেন। পুত্ররত্নকে স্বামীর ক্রোড়ে দিব ভাবিয়া লক্ষ্মীরও আহ্লাদের সীমা ছিল না। গোরাচাঁদ কেবল মনে মনে ফন্দি আঁটিতেছিলেন যে খোকার ভাতে এত লোক খাইবে।

সন্তান লাভে লোকের এত উল্লাস কেন? রাজা বন্দীকে কারামুক্ত করেন। ধনী দরিদ্রকে ধনদান করেন। সামান্য গৃহস্থও সাধ্য মত আনন্দ প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন না। সন্তান উপকার করিবে কি অপকার করিবে চিন্তা নাই; কুল উজ্জ্বল হইবে কি কলঙ্কিত হইবে নিশ্চয় নাই; বাঁচিবে

কি মরিবে জানা নাই। অথচ কতই আহ্লাদ, কতই আনন্দ। ধন্য পিতা মাতা! ধন্য তাঁহাদের নিঃস্বার্থ স্নেহ ও ভালবাসা!

কালাচাঁদের পুত্রের নাম হইল ইন্দু। প্রথম দুএকদিন ইন্দু বাপের কাছে যাইতে বড় ভাল বাসিত না। কালাচাঁদেরও সর্ব্বদা তাহাকে কোলে করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হইত। দিনের বেলা কালাচাঁদ মেয়েটীকে কাছে রাখিয়াই সময় কাটাইতেন। রাত্রিতে বিছানায় যাইয়া ঘুমন্ত ছেলের প্রতি আদর হইত। ঘুম না ভাঙ্গিয়া যায় এরূপ সাবধানতার সহিত তাহার চিবুকটী, কপোলটী, নাকটীতে হাত দিয়া নাড়িতেন, এবং একটী একটী অঙ্গের প্রশংসা করিয়া লক্ষ্মীকে তাহা দেখাইতেন। লক্ষ্মীর হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিত। প্রভাত হইলেই ইন্দু গোরাচাঁদের কোল শোভা করিত। কালাচাঁদের ইচ্ছা গোরাচাঁদ ইন্দুকে লইয়া তাঁহার সম্মুখেই ঘুরিয়া বেড়ান। গোরাচাঁদ তাহা বুঝিতেন না। তিনি খোকাকে কোলে করিয়া বাজারের পয়সা দিতেছেন, অন্য লোকের সহিত কথা কহিতেছেন; একটু আধটু লেখাপড়া কি অন্য কোন সামান্য কাজ হইলে তা'ও চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে সোহাগ হইতেছে। কালাচাঁদ কোথায় থাকেন তাহা তাঁহার খোঁজই নাই। দুই চারি দিন যাইতে কালাচাঁদেরও লজ্জা ভাঙ্গিতে লাগিল; খোকারও যেন তাঁহার প্রতি মায়া বৃদ্ধিতে লাগিল।

এবার পূজার সময়ে কালাচাঁদের ক্ষুদ্র ভবন উল্লাসে পরিপূর্ণ। আত্মীয় কুটুম্ব অনেকেই দেখা দিয়াছেন। কালাচাঁদ এখন দুপয়সা উপার্জ্জন করেন এ কথা দেশে কাহারও জানিতে

বাকি নাই। পয়সা হইলে স্তাবকের অভাব থাকে না। যে সমস্ত লোক এখন আসিয়া কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, ইহাদের অনেকের সহিত কালাচাঁদের পূর্ব্বে জানা শুনাই ছিল না। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া একমাত্র ভ্রাতাকে লইয়া কালাচাঁদ যখন নিঃসহায় অবস্থায় সংসারে ভাসিতেছিলেন তখন কেহই খোঁজ লয়েন নাই। কিন্তু এখন ঝাঁকে ঝাঁকে কুটুম্ব। কতই আলাপ, কতই আত্মীয়তা! কেহ কালাচাঁদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের গুণগান আরম্ভ করিলেন। তিনি বড় দাতা ছিলেন, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার শরীর ছিল, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না, অর্থকে তিনি তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতেন ইত্যাদি কতক প্রকৃত এবং অধিকাংশ অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দু এক জন ঘটকজী কালাচাঁদের কুলনাগায়ের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে এ প্রদেশে ইহাদের ন্যায় সম্মানিত বংশ আ নাই। কুলীন হইয়াও কুলীনের মর্য্যাদা কেবল কালা র পূর্ব্ব-পুরুষেরাই করিতেন। কালাচাঁদ যে কষ্ট পাইবেন না ইহা তাঁহার পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত পুণ্যের ফল। শৈশবে যে ক্লেশ পাইয়াছেন সে তারকব্রহ্ম রামচন্দ্রের বনগমনের ন্যায়। ফলতঃ ইহাদের এতদূর বক্তৃতা করিবার আবশ্যকতা ছিল না। কালাচাঁদ বড়ই বদান্য স্বভাবের লোক ছিলেন। পূজার সময়ে দেশে আসিয়া তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। গ্রামের অনেক দরিদ্র আশা করিয়া থাকিত কালাচাঁদ বাড়ী আসিলে তাহাদের দুঃখের কান্না কাঁদিবে। কুলীন অকুলীন যিনিই আসিতেন, পূজার কয়েক দিন ধরিয়া পর্য্যাপ্ত আহার, এবং

যাইবার সময়ে বংশ মর্য্যাদা অনুসারে একটী টাকা বিদায়ও মিলিত।

যাহারা প্রথম জীবনে কষ্ট পাইয়া শেষে অর্থোপার্জ্জন করে সেইরূপ লোক সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর হইতে দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোকে মনে করে অর্থের অভাবে যে কষ্ট পাইয়াছি কখনও অর্থের অমিত ব্যবহার করিব না। আমার দুঃখের সময়ে কেহ সহানুভূতি দেখায় নাই; আমি কেন অন্যের সাহায্য করিব এইরূপ ভাবিয়া তাহারা যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রতি একরূপ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বসে, এবং যতদূর সম্ভব কৃপণস্বভাবের হইতে চেষ্টা করে। ক্রমে অর্থের প্রতি মমতা জন্মিয়া তাহারা হয়ত আপনাদিগকে অনায়াসলভ্য সুখবিলাসাদিতেও বঞ্চিত করে। ফল এই দাঁড়ায় যে তাহারা প্রথমে পৃথিবী কর্ত্তৃকনিগৃহীত এবং শেষে আপনাকর্ত্তৃক প্রতারিত হয়। কোনকালেই সুখভোগ করিতে পায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ভাবেন অর্থাভাবে মানুষের কি কষ্ট হয় বিশেষ অনুভব করিয়াছি; অতএব সাধ্যানুসারে নিরুপায় ব্যক্তিকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইব না। দুঃখী দেখিলেই ইহাদের হৃদয় দয়ার্দ্র হয়; এবং কার্পণ্যদোষ কখনও ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কালাচাঁদ শেষোক্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। অর্থসঞ্চয়ের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আদৌ ছিল না। পূজার পর বাড়ী হইতে যাইবার সময় তিনি কিছু ঋণী না হইয়া যাইতে পারিতেন না। প্রথমে কর্ম্মস্থল হইতেই বিতরণের জন্যে চাউল এবং বস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বিতরিত হইয়া

যাইত। শেষে প্রার্থীদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। সমস্ত নিঃশেষিত হইলে কালাচাঁদ ধার আরম্ভ করিতেন। সম্ভব মত যাহা পাইতেন তাহাই বিলাইতেন। ক্রমে হাত কমিয়া আসিত। অবশেষে দুএক জনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিক্তহস্তে ফিরাইতে হইত। দাতার স্বভাবই এই। দাতাকে কিছু বণ্টন করিতে দাও। তিনি প্রথমে যে যত চাহিবে তাহাকে ততই দিবেন। শেষে লোকসংখ্যা ভাবিয়া হাত কমাইয়া আনিবেন; সর্ব্বশেষে কাহাকে কাহাকে শূন্যহস্তে বিদায় দিয়া নিজে অপ্রস্তুত হইবেন। কৃপণ তাহা বণ্টন করুক। সে প্রথমেই কুলাইবে না ভয়ে কম কম দিতে আরম্ভ করিবে। শেষে অধিক উদ্বৃত্ত হয় দেখিয়া ভাগের পরিমাণ বাড়াইবে। অবশেষে প্রথমের দ্বিগুণ চতুর্গুণ দিয়াও দেয় সামগ্রী নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এই জন্যই লোকে বলে "দাতার অগ্র, বখিলের (কৃপণের) শেষ।"

চতুর্থ অধ্যায়।

কালাচাঁদ ও লক্ষ্মীর মৃত্যু।

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং
বিকৃতি জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।"

কালাচাঁদের পুত্রের অন্নাশন এবং কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সময় মোক্ষদার বয়স পাঁচ বৎসরেরও কম। পল্লীগ্রামে তখন বিবাহের বয়স লইয়া কোন আন্দোলনই হয় নাই। সুতরাং মোক্ষদার বয়স যে এত অল্প তাহাতে চমকাইবার কোন কারণ নাই। সুপাত্র পাওয়া গেলে যে বয়সেই হউক না কেন কন্যাদান চলে, এই ধারণাই তখন লোকের ছিল। অনেক কন্যার বিবাহ গর্ভে থাকিতে থাকিতেই স্থির হইয়া যাইত। পুত্র কিম্বা কন্যা হইবে নিশ্চয় নাই। কিন্তু পিতা

স্থির করিয়া রাখিতেছেন যে কন্যা হইলেই অমুকের পুত্রের সহিত বিবাহ দিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকা সত্বেও তখন সকল লোকই শৈশবে মরিয়া যাইত না। অনেকেই বৃদ্ধবয়সে বসিয়া প্রপৌত্রের মুখ দেখিত। বাহাত্তর বৎসর বয়সেও খোলা চক্ষে বসিয়া লিখিত। এবং আশী বৎসর বয়সেও দন্তদ্বারা চর্ব্ব্য-বস্তু চর্ব্বণ করিতে ছাড়িত না। রঙ্গ-বিরঙ্গের চশমা অথবা স্বর্ণ রৌপ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম দন্তের এত কাট্‌তি তখন হয় নাই।

মেয়ের বিবাহ এবং ছেলের ভাত উভয় কার্য্যেই কালাচাঁদ প্রচুর ব্যয় করিয়াছেন। সকলকেই যথাসাধ্য দান করা হইয়াছে। যাঁহারা দানগ্রাহী নহেন তাঁহারা আহারে এবং আদরে আপ্যায়িত হইয়াছেন।

সুখের দিন বড়ই শীঘ্র শীঘ্র যায়। কালাচাঁদ শৈশবে যখন কষ্ট পাইয়াছিলেন সে সময়ের কথা এক একটী এখ[illegible] অন্তরে খোদিত রহিয়াছে। এক এক দিনের ঘটনা পুঙ্খানুপূর্ব্বিক বলিয়া দিতে পারেন! কিন্তু যেই একটু সংসারের শ্রী ফিরিয়াছে, অসচ্ছলতা দূর হইয়াছে, সেই দিনের ন্যায় মাস চলিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। কালাচাঁদের সংসার গগনে হঠাৎ এক কাল মেঘ উদিত হইল। সুখসূর্য্য ঢাকিয়া গেল চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল।

বৈশাখ মাস। অল্পদিন মাত্র কালাচাঁদ কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন। কথা নাই বার্ত্তা নাই এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে কালাচাঁদ মিত্রের নৌকা আসিয়া ফতেপুরের ঘাটে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদ হইল কালাচাঁদ মিত্র বাড়ী আসিয়াছেন।

কালাচাঁদ পীড়িত। পীড়া সাংঘাতিক। বৈদ্যেরা যাহাকে বাতশ্লেষ্মক্ষেত্রের জ্বর কহেন কালাচাঁদের তাহাই হইয়াছে। পনের দিনের মধ্যে প্রতীকারের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। নিজের উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই; তিন চারিজনে ধরিয়া কালাচাঁদকে নৌকা হইতে তুলিয়া আনিল। গ্রামের অনেক লোকই দেখিতে আসিল। ফিরিয়া যাইবার সময় অনেকেই কাতর ভাবে কহিতে লাগিল "এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার। আহা! কালা- চাঁদ মিত্র একটী লোক ছিল। জন্মে কারও তৃণগাছটী অনিষ্ট করে নাই, অথচ অনেক গরীবকে অন্ন দিয়াছে।" দুএকজন অনুদার স্বভাবের লোক সহানুভূতিশূন্য স্বরে মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "নিয়তি, নিয়তি-কেন বাধ্যতে, যার যে সময়ে লেখা।"

সমস্ত ফতেপুরের মধ্যে আজি দুইটী প্রাণীই একবারে নিরানন্দ। এক কালাচাঁদের গৃহিণী লক্ষ্মী; দ্বিতীয় গোরাচাঁদ। গোরাচাঁদের স্ত্রী এখনও ছেলে মানুষ, তাই তিনি সম্যক বুঝিতে পারেন নাই যে সংসারে কি বিপদ উপস্থিত। কিন্তু লক্ষ্মী এবং গোরাচাঁদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কালা- চাঁদের পীড়াব অবস্থা যেরূপ তাহাতে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে ইহা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছেন। আছে কেবল এক আশা। আশা প্রিয়জন মৃত্যুশয্যায় নীত হইলেও তাহাকে ফিরাইয়া আনে। দূরস্থ বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ আসিলেও তাহা উপেক্ষা করিতে বলে। কালাচাঁদ ত এখনও ঔষধ খাইতেছেন এবং কথা কহিতেছেন। গোরাচাঁদ ও লক্ষ্মী উভয়েই আশায় বুক বান্ধিলেন। কিন্তু স্ত্রীর ও পুরুষের হৃদয় সমান

নহে। গোরাচাঁদ সাহসে ভর করিয়া অগ্রজের পীড়ার সহিত যুঝিতে লাগিলেন। লক্ষীর কোমল প্রাণ দুশ্চিন্তার প্রতিকূল আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি সাধ্বী রমণী মনে করিলেন আমার সমক্ষে স্বামীর মৃত্যু হইতেই পারে না। ফলতঃ তাহা হইলও না। কালাচাঁদ বাড়ী আসা পর্য্যন্তই লক্ষ্মী আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা স্বামীর শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া থাকিতেন। যখন অপর লোকে দেখিতে আসিত তখন উঠিয়া গিয়া বিরলে বসিয়া কেবল রোদন করিতেন। গোরাচাদ লক্ষ্মীর দিকে দৃষ্টি করেন এমন অবসর ছিল না। জ্ঞানদা জোর করিয়া স্নানের সময় তাঁহার মাথায় একটু তেল লেপিয়া দিতেন। আহারের সময় টানিয়া লইয়া ভাতের কাছে বসাইতেন। কিন্তু যেমন ভাত তেমনই থাকিত। একমাত্র পুত্র ইন্দু যাহাকে কখনও কোল হইতে নামান নাই, তাঁহার প্রতিও আর তেমন যত্ন নাই। সন্তানের জন্মের পর অল্প দিনের মধ্যে পিতা মাতার সাংঘাতিক পীড়া হইলে লোকে বলে মা খেকো কি বাপ-খেকো ছেলে আসিয়াছে। লক্ষ্মীরও মনে বোধ হয় এমনই কোন ধারণা হইয়া থাকিবে।

এই সময়ে ফতেপুরে দুএকটী ওলাওঠা দেখা দিয়াছে। অনাহার অনিয়ম অনিদ্রায় লক্ষ্মীর শরীর ভাঙ্গিয়াইছিল। তিনি হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইলেন। কালাচাঁদের চিকিৎসার জন্য যে ডাক্তার কবিরাজ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিলেন; রীতিমত চিকিৎসা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিন দিনের দিন লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ

রিলেন। কালাচাঁদ রোগ শয্যায় থাকিয়াই স্ত্রীর মৃত্যু বাদ পাইলেন। হৃদয় বসিয়া গেল। একবার লক্ষ্মীর সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিবার জন্তে তিনি উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। ই তাঁহার শেষ শারীরিক উদ্যম। ইহার পর হইতেই পসর্গ সকল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ডাক্তার কবিরাজ কলেই হতাশ হইলেন। কালাচাঁদ কেবল মৃত্যুর দিকে অগ্র-র হইতে লাগিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে যতক্ষণ জ্ঞান লে কালাচাঁদ গ্রামের যাহার সহিত দেখা হইয়াছে তাহাকেই গারাচাঁদের কথা কহিতে লাগিলেন। রামজয় বসু গ্রামের মধ্যে ড় লোক। কালাচাঁদ তাহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া লিতে লাগিলেন গোরাচাঁদ ছেলে মানুষ, শাহাতে কষ্ট পায়, ছেলেবেলায় বড়ই কষ্ট পেয়েছে, সংসারে উহার কেহই হিল না—এই টুকু বলিতে বলিতেই কালাচাঁদের কথা জড়াইয়া াসিল, তিনি জিহ্বা নাড়িতে লাগিলেন, আর কিছুই বুঝা গেল া। তাঁহার কাতর নয়নই কিন্তু মনের ভাব ব্যক্ত করিতে াগিল। গোরাচাঁদ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পাছে ালাচাঁদের সেবা সুশ্রূষার ক্রুটি হয় ভাবিয়া তিনি মাতৃসমা াতৃজায়ার শোক পর্য্যন্ত পাসরিয়া ছিলেন। কিন্তু আর সহ্য রিতে পারিলেন না। কালাচাঁদের অন্তিম কাল উপস্থিত, কবারও তিনি আত্মজ ইন্দুর নাম না করিয়া অনুজ গোরাচাঁদের থাই কেবল কহিতেছেন। তাঁহার মনের ধারণা গোরা-দঁ সুস্থ থাকিলে ইন্দু কখনই কষ্ট পাইবে না। গোরাচাঁদের হা বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিতে পারিলেন বলিয়াই ক ফাটিয়া গেল। ইন্দুর ভাবনা মনে আসিল। পিতৃমাতৃহীন

বালকের কাতর মুখের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে [illegible]কার প্রতিফলিত হইল। কাঁদিলে অগ্রজের উদ্বেগ বৃদ্ধি হইবে, অতএব কাঁদিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা যেন অজ্ঞাতসারে ভাঙ্গিয়া গেল। সমাগত লোকেরা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে, কি কালাচাঁদকে দেখিবে? এদিকে কালাচাঁদকে বাহির করিবার সময় হইয়াছে। গোরাচাঁদের জ্ঞান ছিল না। গ্রামের লোকে ধরিয়া কালাচাঁদের ক্ষীণ দেহ ঘরের বাহির করিল। "দাদা কোথায় যাও" বলিয়া গোরাচাঁদ উন্মাদ বেশে সঙ্গে সঙ্গে উঠানে লাফাইয়া পড়িলেন। কালাচাঁদের দরদরিত চক্ষের তারা উর্দ্ধে উঠিল। তাঁহার জীবলীলা ফুরাইল। দুই দিনের মধ্যে সাধুস্বামী সাধ্বীস্ত্রীর অনুগমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

গোরাচাঁদের ভাবনা

"চিতাচিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা প্রাণান্ সমং বপুঃ।"

যথাসময়ে কালাচাঁদ ও লক্ষ্মীর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। যে কষ্টে গোরাচাঁদ ইন্দুকে সম্মুখে রাখিয়া মন্ত্রপাঠ করাইলেন তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। বালক কিছু না বুঝিয়াই হয়ত উপবাসের দরুন কাঁদিতে লাগিল—কিন্তু গোরাচাঁদের সে ক্রন্দন সহ্য হইল না। এত অল্প বয়সে তিনিও পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন শুনিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বর্ত্তমান ছিলেন, ইন্দুর তাহাও নাই।

শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত গোরাচাঁদ নিদারুণ শোকে অভিভূত ছিলেন। সংসারের চিন্তা তেমন ভাবে তাঁহার মনে উদয়ই হয় নাই।

শ্রাদ্ধের পর হইতেই কিন্তু ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিরূপে সংসার প্রতিপালন করিবেন, কিরূপে ইন্দুকে মানুষ করিবেন, কোথা হইতে অর্থ আসিবে, যুগপৎ এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সংসারে কিসে কি লাগে তাহা গোরাচাঁদ সমস্তই জানেন, কিন্তু অর্থাগম কি উপায়ে হয় তাহা তাঁহার জানা ছিল না। গোরাচাঁদের অর্থের অভাব হইলেই তিনি ধার করিতেন। শোধ করিবার ভার কালাচাঁদের ছিল। গোরাচাঁদকে তজ্জন্য কখনই মাথা ঘামাইতে হয় নাই। গোরাচাঁদ যতই কেন ধার করুন না লোকে কালাচাঁদ বাড়ী আসিলেই তাহার হিসাব দেখাইত; তিনি একবার মাত্র গোরাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত দিয়া দিতেন।। শ্রাদ্ধের সময়েও গোরাচাঁদ এইরূপ ধার করিয়া চালাইয়াছেন। দাদা যে নাই এ কথা যেন তখন তাঁহার মনেই হয় নাই। এখন কিন্তু চমক ভাঙ্গিল। তিনি যেন হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, আর ধার শোধ করিবার জন্য দাদা নাই। কিসে এ দেনা শোধ হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতেই পাঠক অনুমান করিবেন যে, কালাচাঁদ সঞ্চয় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। নগদ টাকা কিছুই ছিল না। পৈতৃক যাহা জমি জিরাত ছিল তাহা এত সামান্য যে তদ্দ্বারা গোরাচাঁদের এখনকার এই ক্ষুদ্র সংসারের ব্যয়ও সংকুলান হয় না। দুএক খানি জিনিস পত্র অবশ্য কালাচাঁদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বেচিলেই বা কদিন চলে। বিশেষতঃ গোরাচাঁদের জীবন থাকিতেও তাহা বেচিবার সংকল্প তাঁহার মনে আসিবে না। এ অবস্থায়

নিজে কিছু অর্থ না আনিলে সংসার কিছুতেই চলিবে না ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু অর্থউপার্জ্জনের পথ কই? বিদ্যা তত অধিক নহে যে তিনি কোন ভাল চাকরি পাইবেন। এদিকে সংসারের যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহাতে এক দিনও বাড়ী ছাড়িয়া থাকিলে চলে না। বাড়ীতেই বা চাকরি কে আনিয়া দেয়? বাড়ীর কাছে চাকরির যায়গা এক শ্যামগঞ্জের নীলকুঠী। কিন্তু নীলকুঠীর চাকরির উপর গোরাচাঁদের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। শঠতা, প্রতারণা, মিথ্যা কথা প্রভৃতি এই চাকরীর অঙ্গ স্বরূপ বলিয়া তাঁহার ধারণা। অনেক সময়ে তিনি নীলকুঠীর বড় বড় কর্ম্মচারীকে তাহাদের দোষ দেখাইয়া বিদ্রূপচ্ছলে মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। এখন নিজে কিরূপে তাহাদের অধীনে সেইরূপ কর্ম্মগ্রহণ করিবেন? সমস্ত ভাবিয়া গোরাচাঁদ পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন। যে দিকে চান সেই দিকেই ভয় এবং ভাবনা। সে অসমসাহস কোথায় গিয়াছে। ঔদ্ধত্যের ত লেশ মাত্রও নাই। যে গোরাচাঁদ সংসারে কেবল ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়াকে আপনার পূজ্য মনে করিতেন, তিনি এখন ক্ষুদ্র তৃণকণাটীকেও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। ভয় কাহাকে বলে তাহা যাঁহার জানা ছিল না; তিনি এখন সামান্য শুষ্ক পত্রটীর শব্দ শুনিলে আতঙ্কে কম্পিত হন—ঐ বুঝি কোন পাওনাদার আসিতেছে। পশ্চাৎ হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুমধুর স্বরে ডাকিলেও তিনি ভয়ে কম্পিত হন। ফলতঃ গোরাচাঁদের স্বভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে গোরাচাঁদ আর নাই। মুখের সে হাসি কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

পরিচ্ছদের সে আড়ম্বর কিছুই নাই। পূর্ব্বে যে লোকের সহিত কথা কহিবার কখনও আবশ্যকতা হয় নাই এখন তাহাকে দেখিলেও ডাকিয়া একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। এক সময়ের গোঁয়ার গোরাচাঁদ এখন ফতেপুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মাটীর মানুষ।

গোরাচাঁদের এ পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে। সংসারে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, পিতা সংসার চালাইতেছেন, পয়সা আনিতেছেন; সোহাগের পুতুল পুত্র তাহা মদে বাবুগিরিতে উড়াইতেছেন। পিতার শত প্রকার চেষ্টা সত্বেও তাঁহার জীবন সময়ে পুত্রের স্বভাব শুধরাইল না। কিন্তু যে দিন পিতার মৃত্যু হইল, সংসারের ভার পুত্রের প্রতি পড়িল, আপনাকে পয়সা আনিবার উপায় চিন্তা করিতে হইল, অমনি যেন আপনা আপনিই তিনি সাধু এবং সদ্ব্যয়ী হইয়া উঠিলেন। সে বেধড়ক মাতলামি এবং বে-আন্দাজ বাবুগিরি কোথায় চলিয়া গেল। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই যে আগুনে পুড়িলে যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের মলিনত্ব বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ শোক এবং চিন্তাগ্নিতে পড়িলে, মানুষের স্বভাবের বিকৃতি যাহা, তাহাও দগ্ধ হইয়া যায়। তাপ অধিক হইলে যেমন ময়লা কিছুই থাকে না, কিন্তু অল্প মাত্র উত্তাপে অনেক সময়ে কিছু কিছু রহিয়া যায়, তদ্রূপ কেবল মাত্র শোকাগ্নিতে অনেকের স্বভাববিকৃতি সম্পূর্ণ দূর হয় না। এই জন্যেই ধনী সন্তানদিগকে অনেক সময়েই অভিভাবকের মৃত্যুর পরেও কদাচারী থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু শোকের সহিত দরিদ্রতা বহ্নি যুগপৎ জ্বলিলে কাহার সাধ্য যে খাঁটি স্বভাব না দেখাইয়া

থাকিতে পারে? ঔদ্ধত্য, কদাচার প্রভৃতি মানবস্বভাবের বিকৃতি।

গোরাচাঁদের পক্ষে শোকাগ্নি অপেক্ষা চিন্তাগ্নিই অধিক প্রবল হইয়া উঠিল। অন্ন চিন্তা না থাকিলে বোধ হয় তাঁহার এত কষ্ট হইত না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং গতান্তর না দেখিয়া অবশেষে গোরাচাঁদ একটী নীলকুঠীর সামান্য চাকরীর চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। চারি টাকা বেতনে নিজ গ্রামেই তাঁহার আমিনী কর্ম্ম হইল। কালাচাঁদ মিত্রের ভাই নীলকুঠীর আমিন হইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবে এ কথা এক সময়ে লোকে মনেও করিতে পারে নাই। কিন্তু সময়! সময় কাহারও পক্ষে চির দিন সমান থাকে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গোরাচাঁদের চাকরী ত্যাগ।

"উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা॥"

গোরাচাঁদের জীবনের সুখের সময় কাটিয়া গিয়াছে। দুঃখের দিন উপস্থিত। শৈশবে দাদার কোলে মানুষ; যৌবনেও তাঁহারই যত্নে প্রতিপালিত। কিন্তু এখন আর এমন কেহই নাই যাহার উপর তিনি এক দিনের জন্যেও নির্ভর করিতে পারেন। বাড়ীর অবস্থা আর তেমন নাই। যে বাড়ীতে প্রতিদিন অতিথি, অভ্যাগত প্রভৃতি আট দশ জন লোকের পাতা পড়িত এখন অনেক দিন গোরাচাঁদ সেখানে একাকী আহার করেন। মধুমক্ষিকার দল পলাইয়াছে। চক্রে মধু নাই এ কথা তাহাদিগকে বলিয়া দিতে হয় নাই; আপনারাই বুঝিয়া লইয়াছে।

এত অল্প পরিবারেও কিন্তু গোরাচাঁদের এই ক্ষুদ্র আয়ে কুলাইয়া উঠে না। সর্ব্বদাই টানাটানি। যাহার হাত একবার বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে তাহা কমান বড়ই দুঃসাধ্য। বাড়ীতে লোকটী জনটী আসিলে এখনও সেই যত্ন, সেই আদর। মধ্যে মধ্যে গোরাচাঁদ প্রায়ই ধার করেন। দু এক সময়ে ভাবেন, কি সাহসে এখন ধার করি? অমনি চারিদিক অন্ধকার দেখেন। মনে হয় দাদা যদি কিছু রাখিয়া যাইতেন। পরক্ষণেই ভাবেন দাদার দোষ কি? সবই ত আমার হাতে ছিল। আমি যদি একটু রাখিয়া চলিতাম, ভবিষ্যতের ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে কখনই এমন হইত না। দাদা ত কখনও আমার ইচ্ছায় বাধা দেন নাই। কত পয়সাই কতরকমে ব্যয় করিয়াছি। বাড়ীর দুই জন চাকরে চারি টাকা বেতন পাইয়াছে। আর আমি এখন চারি টাকার চাকরীর জন্যে লালায়িত।

গোরাচাঁদের মন ক্রমশঃই বিষণ্ণ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরও শীর্ণ হইতেছে। মনে সুখ থাকিলে মানুষ না খাইয়াও হৃষ্ট পুষ্ট থাকে। কিন্তু অন্তরে চিন্তা থাকিলে রীতিমত আহার পাইয়াও মানুষ আপনা আপনি মলিন এবং শুষ্ক হইয়া যায়। জ্ঞানদার যত্নের ক্রটি নাই। তিনি বয়সে বালিকা হইলেও সংসারের ভার স্কন্ধে পড়ায় কার্য্যে প্রবীণা হইয়া উঠিয়াছেন। যাহাতে গোরাচাঁদকে বাড়ীর ভিতরের কোন ভাবনাই না ভাবিতে হয়, তাহার চেষ্টা তিনি যতদূর সাধ্য করিতেন। রন্ধন, ইন্দুকে খাওয়ান দাওয়ান, এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্ম যাহা তাঁহার আয়ত্ত সে সমস্তই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। গোরাচাঁদকে ভাবিতে দেখিলেই নিজে কাছে যাইয়া বুদ্ধিমত ভরসা

দিতেন ও সাহসবাক্য বলিতেন। স্ত্রীলোকের প্রধান সাহস ঈশ্বরে নির্ভর। জ্ঞানদা প্রায়ই বলিতেন জগদীশ্বর আছেন; তিনিই চালাইবেন। গোরাচাঁদের হৃদয় কিন্তু ইহাতে মানিত না। তিনি ভাবিতেন স্ত্রীলোক, কেবল ঈশ্বরের দোহাই দিতেছে। কিন্তু নিজে কোন পথ দেখিয়া লওয়া চাই যাহাতে ঈশ্বর সাহায্য করিবেন।

কালাচাঁদের মৃত্যুর পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়াছে। কষ্টেই গোরাচাঁদের দিন কাটিতেছে। কিন্তু কুঠীর চাকরি টুকুতে তবু এক রূপ চলিয়াছে; এখন হঠাৎ একদিন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যাহাতে এই ক্ষুদ্র অবলম্বনটীও পরিত্যাগ করিতে হইল। কুঠীর চাকরীর উপর তাঁহার চিরকালই ঘৃণা ছিল। তবে উপায়ান্তর না থাকায় তিনি এই আমিনী গ্রহণ করেন। চাকরীতে ঢুকিবার পর এক দিনও তাঁহার ভাল যায় নাই। প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট। গোরাচাঁদ মিথ্যা ব্যবহারের শত্রু ছিলেন। তাঁহার স্বভাবে বাহ্যিক অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও মনের উচ্চতা কিছুমাত্র কমে নাই। কুঠীর ক্ষুদ্র চাকরীর নিয়মই এই যে, তুমি নিজে চুরি কর বা না কর প্রজার বুকে ছুরি মারিতেই হইবে। কেননা দেওয়ান নায়েব প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারীর ত পূজা চাই। প্রজার জমিতে ঘাস বাছিতে কুলি লাগিয়াছে দশজন, লিখিতে হইবে ত্রিশজন। বিশজনের বেতন আমলাদিগের মধ্যে বণ্টন হইবে। প্রজার জমিতে নীল হইয়াছে সাত বাণ্ডিল, দেখাইতে হইবে চারি বাণ্ডিল। বাকি তিন বাণ্ডিল এক কৃত্রিম নামে রাখিয়া সাহেবের নিকট হইতে টাকা লইতে হইবে, এবং তাহাও

ঐরূপ ভোগে লাগিবে। নীলকুঠীর এরূপ ব্যবহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলে সাধুভাবে প্রবেশ করিলেও তাঁহাকে হয় ইহার অংশী হইতে হইবে, নচেৎ পদত্যাগ। ফলতঃ বাঙ্গালায় যাঁহারা নীলকরের অত্যাচার নীলকরের অত্যাচার বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা জানেন না যে ভিতরে ভিতরে অনেক অত্যাচার বাঙ্গালী কর্ত্তৃকই সংসাধিত হয়। গোরাচাঁদের দুর্ব্বল অন্তঃকরণে তিনি এই সমস্ত কার্য্যকে চুরি বলিয়া মনে করিতেন; এবং এক বৎসরের মধ্যে কখনও ইহাতে যোগ দেন নাই। সুতরাং তাঁহার মহলে উপরিস্থ কর্ম্মচারীর প্রাপ্তি বড় কম হইত। এজন্য তাহারা সকলেই তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। কিরূপে তাঁহাকে তাড়াইবেন এই উদ্যোগ অনেক দিন হইতে চলিতেছিল। সহসা এক সুযোগ উপস্থিত হইল।

ফতেপুরের এক মুসলমানের সহিত সাহেবের এক মোকর্দ্দমা। কতকখানি জমি সাহেব তাহার ইজারা বলিয়া দাবি করেন। সে বলে উহা তাহার নাখেরাজ। সাহেব স্বত্ব সাব্যস্তের নালিস করিয়াছেন। বহু পূর্ব্ব হইতেই সে জমি মুসলমানের দখলে। কিন্তু সাহেব নালিস করিয়াছেন যে গত বৎসর বেদখল করিয়াছে। দেওয়ানজী সমস্তই জানেন। তিনি গোরাচাঁদকে একের নম্বর সাক্ষী করিয়া রাখিয়াছেন। ধার্য্য দিনের আটদশ দিন পূর্ব্বে এক দিন দেওয়ানজী সাহেবকে কহিলেন, "হুজুর ইদুশেখের মোকর্দ্দমায় গোরাচাঁদ মিত্রকে সাক্ষী মান্য করা গিয়াছে। কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে হুজুর তাকে স্বয়ং সমজাইয়া না দিলে সে সাক্ষ্য দিতে না চায়।

হিন্দুলোক, সাক্ষ্য দিতে বড় নারাজ।" সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা বোলাও একরোজ গোরাচাঁদ মিটুকো হামারা কোঠীমে।"

তার পর দিনই দেওয়ানজী গোরাচাঁদকে সাহেবের আদেশ জানাইয়া দিলেন। নিরূপিত সময়ে গোরাচাঁদ কুঠীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বরকন্দাজ খবর আনিলে আস্তে আস্তে খালি পায়ে কামরার দরজায় প্রবেশ করিলেন। (নীলকুঠীর সাহেবের কামরায় জুতা লইয়া আমলার প্রবেশ বে-আদবি।) ভূমি হইতে হাত তুলিয়া সেলাম ঠুকিয়া গোরাচাঁদ সেই সাহেব মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সা। গোরাচাঁদ টোমাকে ইডু শেখের মোকড্ডমায় সাক্ষ্য ডিতে হইবে।

গো। আমি সে মোকর্দ্দমার কিছুই জানি না। হুজুর! কি সাক্ষ্য দিব?

সা। কি হামি শুনেছে টুমি সব জানে। টোমর বাঙ্গালী আড্মি, সাক্ষী দিটে এট ডর আছে?

গো। আজ্ঞে আমি আরও জানি সে জমি তারই দখলে।

সা। নেই নেই কাহে ঝুট্ বোল্টা। হাম জানটা টোম্ ভডর্ লোক আছে।

সাহেব গরম হইয়াছেন। গরম হইলেই তাহার মুখে হিন্দি বাঙ্গালা মিশ্রিত বাহির হইত।

গো। হুজুর আমি বাস্তবিকই কুঠীর স্বপক্ষে কিছু জানি না!

সা। হাঁ কুঠীর স্বপক্ষে টোম্‌কো বোল্‌নে হোগা।

গো। কেমন করে মিথ্যা কথা বলিব হুজুর?

সা। হাঁ বাঙ্গালী আড্মি বড়া সাটু! মার্কলে

সাহেব লিখা, এয়সা মিঠ্যুক আড্‌মি ডুনিয়া পর ডোসরা নেহি হায়।

সাহেব মেকলের নাম মার্কলে বলিয়া জানিতেন।

গো। হুজুর! আমার চৌদ্দ পুরুষেও কখনও মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় নি। চাকরী না থাকিলেও আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।

সা। ক্যা গোষ্ঠাগী-নিকাল, নিকাল, বজ্জাট, শুয়ার।

"চুপ সাহেব, রইল এই তোমার চাকরী," বলিয়া অপমানে, ক্রোধে ও দুঃখে অধীর হইয়া গোরাচাঁদ বাড়ী মুখে প্রস্থান করিলেন।

দেওয়ানজী এতক্ষণ কেবল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন এবং এক একবার গিয়া নায়েব মহাশয়কে বলিয়া আসিতেছিলেন, "শালা এইবার পড়েছেন ফাঁদে" "হয়ে এল, আর দেরী নাই।" শেষে গোরাচাঁদকে ঐ ভাবে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া আসিয়া কহিলেন, "কি তেজ শালার! কিছু যে নাই তবু দম্ভ কত। আমি ত ওর চেয়ে কতবড় চাকরী করি। কিন্তু ইংরেজের সামনে অমন কলা দেখাইয়া আসা আমার বাবা এলেও পারিত না।"



সপ্তম অধ্যায়।

গোরাচাঁদের শেষ ভাবনা।

"ত্যজেৎ ক্ষুধার্ত্তা মহিলা স্বপুত্রং।"

চাকরী ছাড়িয়া গোরাচাঁদ বাড়ী আসিলেন বটে কিন্তু এবার ভাবনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। সংসার কিসে চলিবে তাহার কিছুই উপায় নাই। শ্যামগঞ্জে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়। পল্লী-গ্রামের লোকে হাটেই প্রায় সমস্ত জিনিস কিনিয়া রাখে। হাটের দিন আসিলেই গোরাচাঁদের বুক শুকাইয়া যায়। ধার ভিন্ন আর কথা নাই। পূর্ব্বে চাহিলেই ধার মিলিত, কিন্তু এখন আর তেমন নাই। জিনিসপত্র কিছু বন্ধক না দিলে আর লোকে ধার দেয় না। লোকের এক সম্বল থাকে স্ত্রীলোকের গায়ের গহনা। গোরাচাঁদের গৃহে তাহাও অতি সামান্ত ছিল। লক্ষ্মীর গায়ের

যাহা কিছু তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্তই মোক্ষদাকে দেওয়া হয়। জ্ঞানদার অঙ্গে অবশ্য দুচারি খানি অলঙ্কার ছিল। কিন্তু তাহাও তত মূল্যবান নহে। তখনকার গহনাই মোটামুটি ছিল। বিশেষতঃ সে সময়ের পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা বড়ই মূর্খ ছিলেন। আজি কালিকার কুমুদিনী বিনোদিনীদিগের মত তাঁহারা স্বামীর নিকট হইতে অলঙ্কার আদায় করিবার কৌশল অবগত ছিলেন না। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। কপালে সিন্দূর এবং হাতে লোহ এবং শঙ্খ তাহাদের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ছিল। স্বামী যাহা ইচ্ছা করিয়া দিতেন তাহাই তাঁহারা আদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু পতির নিকট আব্দার করিয়া, অথবা পরিবারস্থ অন্যে অন্ন না পাইলেও জোর করিয়া তাহার কোমর ধরিয়া গহনা আদায় করিতে হয় এ নিয়ম তাঁহাদের জানা ছিল না। নতুবা এক সময়ে কালাচাঁদ মিত্রের যে সংসার ছিল তাহাতে তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকের অঙ্গে দু চারি খানি ভাল গহনাই থাকিবার কথা।

গোরাচাঁদ প্রথমে বাহিরের জিনিসগুলি বন্ধক দিতে আরম্ভ করিলেন। আজি শতরঞ্চ খানি, কালি গালিচাটী এইরূপ করিয়া বড় বড় জিনিসপত্র যা ছিল পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই সমস্ত মহাজনের ঘরে গেল। ক্রমে বাসনগুলির যাহা না হইলে নয় তাহা বাদে বাকি সকলই তিলি, তাম্লি প্রভৃতি দোকানদারের সিন্দুকের নীচে গিয়া জমা হইতে লাগিল। সাত আটটী গরু ছিল; দুধ খাইবার জন্যে একটী মাত্র গাভী রাখিয়া গোরাচাঁদ সমস্তই বেচিলেন। রাখাল চলিয়া গেল। অবশেষে জ্ঞানদার গায়ে হাত পড়িল। যাহা কয়েকখানি গহনা ছিল দেখিতে

দেখিতে সবই গেল। দুগাছি বালায় ঠেকিল। তাহাও সোণার নহে, রূপার। তাহাতেই বা ক টাকা মিলিবে? অথচ সধবার অঙ্গ হইতে বালা দুগাছি পর্য্যন্ত উন্মোচন করিতে গোরাচাঁদের কিছুতেই প্রাণ সরিল না।

আজি বুধবার, শ্যামগঞ্জের হাট। বেলা দুই প্রহরের পর হইতেই গোরাচাঁদ বাহিরের ঘরে বসিয়া মুখে একটী হাত দিয়া ভাবিতেছেন কি লইয়া হাটে যাইবেন। ঘরে একটী পয়সাও নাই অথচ এমন কোন জিনিষ পত্রও নাই যাহা বেচিতে বা বন্দক দিতে পারেন। ধারে কেহই কোন জিনিস দিবে না। বরং হাটে গেলেই এ ও সে বলিবে "মশাই, টাকা কটীর কি? দুমাসের মধ্যে শোধ করিবার কথা ছিল। তিন মাস যায়। আর শুদ বাড়াইয়া লাভ কি? বলেন ত জিনিস গুলি বেচে ফেলি।"

গোরাচাঁদ বসিয়া এক একবার তামাক টানিতেছেন, আর এইরূপ আকাশপাতাল ভাবিতেছেন। মনে হইতেছে "আহা! আজি যদি কেহ একটী টাকা ধার দেয়।"

রঘুনাথ দাস নামে এক কৈবর্ত্ত মিত্রদিগের বর্গাইত, অর্থাৎ ভাগে জমি চাষ করে। সে একটী ধামা হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ধামার মধ্যে একটী তেল আনিবার বোতল। বোতলের দড়িটী ধরিয়া ধামাটী ঝুলাইতে ঝুলাইতে রঘু আসিয়া বাহিরের বারাণ্ডা হইতেই গোরাচাঁদকে নমস্কার করিল। "আশীর্ব্বাদের আজ্ঞা, ছোট কর্ত্তা।"

গোরাচাঁদ ভাবনায় অন্যমনস্ক ছিলেন। সহসা মনুষ্যের স্বর শুনিয়া চকিতের ন্যায় সম্মুখে চাহিয়া দেখেন রঘু। "এস

রঘু” বলিয়া হুকার মাথা হইতে কলিকাটী নামাইয়া দিলেন। রঘু কহিল, “সারা দিন ওরকম করে ভাবিলে কি আর শরীর থাকিবে ?”

গো। কি করি রঘু না ভেবে থাকিতে পারি না। কি ছিলাম, আর কি হয়েছি। আজ এই এক হাটের দিন ; একটা পয়সাও হাতে নাই। কি দিয়া যে কি হবে কিছুই ঠিক নাই।

রঘু। হাট থেকে কি আনতে হবে বলুন। আমি দুটাকার ধান তুলে দিয়াছি কুমারদের নৌকায়। বেচে হাট করিব। আমার কিছু দুটাকার দরকার হবে না। কি কি আপনাদের চাই বলুন।

রঘুর এই কয়েকটী কথাতে গোরাচাঁদ যেন তখনকার মত অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। একবার বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গিয়া সেদিনকার হাটের আবশ্যক দ্রব্যাদির নাম জানিয়া আসিয়া রঘুকে কহিয়া দিলেন। মনে মনে রঘুকে যে ধন্যবাদ দিলেন ইহা বলাই বাহুল্য।

রঘু চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন “আমি যদি ভদ্রবংশে না জন্মিয়া রঘুর মতন হইতাম তাহা হইলেও শরীর খাটাইয়া খাইতে পারিতাম ; এত কষ্ট কখনই হইত না।”

গোরাচাঁদের চাকরী ত্যাগের পর দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বর্ণনা অতি সহজ ; আমরা এক মুহূর্ত্তে দেড় বৎসরের কথা বলিয়া ফেলিলাম ; কিন্তু গোরাচাঁদের পক্ষে ইহার এক একটী দিন এক এক বৎসরের সমান বোধ হইয়াছে। এখন যেমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কালি কি খাইবেন ঘরে এমন সংস্থান নাই। গোরাচাঁদ যাহা কখনও ভাবেন নাই

এখন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। জ্ঞানদা এবং ইন্দুকে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি বিদেশে বাহির হইবেন। বিদেশে গেলেই যে তিনি পয়সা পাইবেন এ ভরসা তাঁহার নাই। কোথায় যাইবেন তাহাও নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বাড়ীর বাহির হইলে তাঁহার নিজের পেটটা কমিবে আর ইন্দু জ্ঞানদার কষ্ট তাঁহাকে দেখিতে হইবে না অবশেষে যেন এইরূপ চিন্তাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন "দাদা যেখানে চাকরী করিতেন সেইখানে যাই। এত লোকে তাঁহাকে জানিত, তাঁহার ভাই বলিয়া অবশ্য আমাকে দয়া করিবে। সেই জমিদারকে গিয়া ধরিয়া পড়িব। দাদাকে এত ভাল বাসিতেন শুনিয়াছি, আমাকে যা হউক একটা কিছু করে দেবেনই।" এই সংকল্পই উত্তম বলিয়া মনে হইল। সোমবার গোরাচাঁদ বাড়ী হইতে বাহির হইবেন স্থির হইয়া গেল।

অষ্টম অধ্যায়।

গোরাচাঁদের পীড়া।

"নিধননির্ধনয়োর্ নির্ধনং বরং।"

ইহার মধ্যেই এক নূতন বিপদ উপস্থিত। সোমবার সকালে গোরাচাঁদ বিদেশ যাত্রা করিবেন, শনিবার রাত্রেই তাঁহার একটু জ্বর হইল। পেটে বেদনা, পেটে বেদনা বলিতে লাগিলেন। রবিবারে উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটু স্ফীতি দেখা গেল। সোমবারে তাহা গোল হইয়া উঠিল। সেইদিন প্রভাতে গোরাচাঁদ শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন "গরীবের ঘরে মহতের ব্যারাম কেন?" গোরাচাঁদের রাজব্রণ হইয়াছে।

যে দেখিতে আসিল সেই বলিল গ্রাম্য কবিরাজে ইহার কিছুই করিতে পারিবে না। গোবিন্দবেড় হইতে ডাক্তার আনা উচিত। গোবিন্দবেড় ফতেপুরের নিকটবর্ত্তী নগর।

রঘুনাথ শুনিবামাত্রই গোবিন্দবেড়াভিমুখে ছুটিল। ডাক্তার বাবু আসিলেন। কালাচাঁদের পীড়ার সময়ে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনিই।

ডাক্তারকে টাকা দিতে হইবে জ্ঞানদা জানিতেন। ঘরে একটীও টাকা নাই। জ্ঞানদা দৌড়াদৌড়ি স্বর্ণকুমারণীর বাড়ীতে গেলেন। স্বর্ণ টাকা ধার দেয়।

জ্ঞানদা কহিলেন দিদি, পাঁচটী টাকা ধার দিতে পার?

স্ব। কেন বোন্?

জ্ঞা। ডাক্তার এসেছে তার বিজিট দিতে হবে, আর নৌকা ভাড়া। আচ্ছা দিদি, ও ব্যারাম কদিনে সারে?

স্ব। তা বোন্ ভগবানের ইচ্ছা। ডাক্তর এসেছে, পাক্‌লে তবে কাট্‌বে কুট্‌বে, তার পর ঘা শুকাতে দেরী হইবে।

জ্ঞানদারবুকের রক্ত জল হইয়া গেল। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা না কাটিলে সারে না?"

স্ব। তা কেমন করে বলিব? নূতন ব্যারাম। তবে শুন্‌লাম এসব ব্যারামে ওরা কাটে কোটে। এই ঘা ফোঁড়ার পক্ষেই ভাল। আমরা ত কখনও ডাক্তার দেখি নাই। এ গ্রামে তোমার ভাশুরের ব্যারাম হইতেই প্রথম ডাক্তর এসেছে।

জ্ঞানদা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "দিদি যা বল্লাম—পাঁচটী টাকা।"

স্ব। তা ভাই জান ত আমার নিজের কিছুই নাই! পরের ধনে পোদ্দারী। ইনি, উনি, তিনি ছেলেকে লুকিয়ে, স্বামীকে লুকিয়ে যা রাখ্‌তে পারেন এনে আমার কাছে দেওয়া হয়।

লাভের নামে ত ছাই—মাঝখান্ থেকে বদ্‌নামটী খুব। "স্বর্ণকুমারণী মহাজন, স্বর্ণকুমারণী মহাজন।" যার টাকা, হয় ত তারই ছেলেকে কি স্বামীকে ধার দিচ্ছি, আসল ও পাচ্ছে সে, শুদ ও পাচ্ছে সে। আমার কেবল ভূতের বেগার। এই ত মহাজনী।

জ্ঞানদার স্বর্ণের এই সুদীর্ঘ মন্তব্য শুনিবার সময় ছিল না। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন "দিদি পাঁচটী টাকা হবে না?"

স্ব। হ'তে পারে ভাই, সবে পাঁচটী টাকাই হাতে আছে। সে রামার মার। আজ সকালবেলা নাইতে যাবার সময় দিয়ে গেল। সে ত জান কেমন শুদখোর। মাসে টাকাটার চারি পয়সার কমে কিছুতেই তার টাকা ছাড়ে না।

জ্ঞানদা রামার মাকেই জানেন অতি অল্প। তার শুদ খাইবার প্রবৃত্তির পরিচয় কখনই পান নাই। স্বর্ণের ভূমিকার অর্থ বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। কহিলেন তা আমি সেই চারি পয়সা করেই দিব।

স্ব। তা ত দেবে ভাই আর একটা কথা—বল্‌তেও লজ্জা করে, আমার ত আর তোমার করে অবিশ্বাস নাই, কিন্তু রামার মা বলেছে বন্দক না হ'লে টাকা দিও না। কি করি ভাই, নিজের ত টাকা নয়, সে বলিলেও বুঝিবে না।

জ্ঞা। দিদি জান ত আমাদের ঘরে আর কিছুই নাই—কেবল যা কখানি বাসন। চারিখানি থালা, দশটী বাটী, তিনটী ঘটী আর একটী গাড়ু আছে। রেকাবগুলি পর্য্যন্ত গিয়াছে। তা না হয় তুমি যা রাখ্‌তে চাও, বল, এনে দিচ্ছি। জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিলেন। চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন, এই উনি বিদেশে বেরুচ্ছিলেন; তা দেখ কেমন বিপদ!

স্ব। কাঁদ কেন ভাই, পরের বিশ্বাস, আমি কি করিব? তা বেশী কায নাই, তাকে বুঝিয়ে বল্‌ব এখন; তুমি তুখানা থালা, তুটী ঘটী আর ছটী বাটী রেখে যাও। তোমাদের বাড়ীর বাসন ত সবই ভারী। কদিন না হয় চেয়ে চিন্তে চালিও। আমার বাড়ীতে কুটুম্, তা না হ'লে আমিই তোমাকে তু একখানা ধার দিতে পার্ত্তুম।

জ্ঞানদা যেন ইহাতেই মহাসন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন। বাটীতে আসিয়া তুখানি থালার উপর বাটী কয়েকটী রাখিয়া বামকক্ষে বসাইলেন। দক্ষিণ হস্তে ঘটী তুইটী লইয়া শীঘ্র হইবে বলিয়া সোজা পথে বাহিরের দিক দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে ডাক্তার বাবুর সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কোথায় যাইতেছেন?"

রঘুনাথ দাঁড়াইয়া ছিল। সে উত্তর করিল "আজ্ঞে আপনার বিজিট্—ঐগুলি বান্ধা দিয়ে"—রঘুর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ডা। আমি বিজিট চাই না। ওঁকে ফিরে আসতে বল।

র। আজ্ঞে নৌকা ভাড়া?

ডা। না নৌকা ভাড়াও দিতে হবে না। এই নৌকায় আমি আরও তু এক যায়গায় যাব। সেখানে ভাড়া পাওয়া যাবে।

গোরাচাঁদ শয্যায় থাকিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন; নীরবে ডাক্তর বাবুর দিকে কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। নিমেষ মধ্যে চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। ডাক্তার বাবুও অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

নবম অধ্যায়।

গোরাচাঁদের মৃত্যু।

"কায়প্রাণৈর্ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা।"

ফোঁড়া অস্ত্র করা হইল। আট দশ দিন ডাক্তর আসিলেন। কিন্তু গোরাচাঁদের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল ডাক্তর বাবুর যত্নের ত্রুটি নাই। অন্যত্র টাকা পাইয়া দেখেন, গোরাচাঁদকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেছেন। সেখানে পয়সার টান; এখানে অন্তরের মমতা। কালাচাঁদের পীড়ার সময়ে ইনি বিস্তর পয়সা পাইয়াছিলেন, গোরাচাঁদের বেলায় নৌকা ভাড়াটী পর্য্যন্ত যুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া ডাক্তার বাবু যেন নিজেই গোরাচাঁদের অভিভাবক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বুদ্ধি যতদূর যুরিল তাহাতে চিকিৎসার কোনরূপ ত্রুটি রহিল না।

পরমায়ু না থাকিলে চিকিৎসায় কি হইবে? গোরাচাঁদ ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। প্রত্যহ জ্বর হইতে লাগিল। যে সোমবারে গোরাচাঁদের পীড়া আরম্ভ, তাহার পরের সোমবার চলিয়া গিয়াছে। বুধবার প্রাতে ডাক্তার বাবু আসিয়া গোরাচাঁদের যে অবস্থা দেখিলেন তাহাতে নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে তিনি আর টিকিবেন না।

গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার বাবু, আমি কি খাব?"

ডা। কি খেতে ইচ্ছা হয়?

গো। হা রে কপাল! আমার আবার ইচ্ছা। আপনার ঐ দুদসাবুই খেতে পারি, কিন্তু একটু মিষ্টি।

গোরাচাঁদ শৈশব হইতে মিষ্টি বড় ভাল বাসেন। হাট হইতে বাতাসা আসিলে লক্ষ্মী তাঁহার জন্যে বড় বড় এবং যোড়া বাতাসাগুলি বাছিয়া রাখিয়া দিতেন। মিষ্টি না থাকিলে গোরাচাঁদ দুদ খাইতে পারিতেন না। সেই গোরাচাঁদ ব্যারাম হওয়া পর্য্যন্ত ডাক্তারের কথায় একটুকুও মিষ্টি খাইতে পান নাই। আজি কিন্তু ডাক্তার বাবুর আপত্তি রহিল না। তিনি একটু মুখ বাঁকাইয়া রঘুর দিকে চাহিয়া কহিলেন দেখ যদি একটু সাফ্ চিনি কি বাতাসা পাও তবে এনে দাও।

রঘু কাঁদিয়া ফেলিল। গোরাচাঁদের অবস্থা দেখিয়াই তাহার অনুমান হইয়াছিল যে তাঁহার বাঁচিবার ভরসা অতি অল্প; কিন্তু এখন ডাক্তার বাবুর মুখ দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া সে একেবারেই হতাশ হইল। ব্যারামের আরম্ভ থেকেই ডাক্তার বাবু বলেছেন যে মিষ্টি এঁর পক্ষে বড়ই খারাপ;

আজি কিনা তিনিই বল্‌ছেন চিনি কি বাতাসা যা পাও এনে দাও।

গোরাচাঁদ নিজেও বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার অন্তিম সময় নিকট। রঘুকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "রঘুরে, এদের উপায় কি হবে?" রঘু আরও বেগে কাঁদিতে লাগিল।

আহা! এমন সময়েও গোরাচাঁদের নিজের ভাবনা নাই। তিনি কেবল ইন্দু জ্ঞানদার কথাই ভাবিতেছেন। ধন্য সংসারের মায়া! শেষ সময় পর্য্যন্তও মানুষ আপনার জনের ভাবনা ভাবিয়া অস্থির। আপনার যে কেহই নহে, নিজের দেহ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবে, মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কয় জনে ইহা ভাবিয়া থাকেন? গোরাচাঁদের মনে এখনও এক একবার আশা আসিতেছে যে তিনি মরিবেন না; ইন্দু জ্ঞানদা একবারে অনাথ হইবে না। হায়! পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষও যদি আপনার সময় বুঝিতে পারিত এবং দিন থাকিতে নিজের পরকালের নিমিত্ত চিন্তা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় সংসার এত দুঃখের স্থান হইত না।

গোরাচাঁদ বলিলেন রঘু, একবার রামজয় বসুকে ডেকে আন্। রঘু বাড়ীর ভিতরে গিয়া জ্ঞানদাকে মিষ্টির কথা বলিয়া নিজে রামজয়কে ডাকিতে গেল।

জ্ঞানদা সর্ব্বদাই গোরাচাঁদের ঘরেই থাকেন। ডাক্তার বাবু কিম্বা অন্য কেহ আসিলে আড়ালে গিয়া দাঁড়ান; একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে তাঁহাকে রন্ধনশালা কিম্বা বাড়ীর ভিতরে অন্যস্থানে যাইতে হয়। চক্ষে জল লাগিয়াই রহিয়াছে। রঘু গিয়া বলিলেও তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এই তাঁহার

স্বামীর শেষ আবদার। পূর্ব্বরাত্রিতে গোরাচাঁদের বড়ই যন্ত্রণা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত বলিয়া একবারও জ্ঞানদার মনে হয় নাই। সরলা রমণী মনে করিলেন মিষ্টি বুঝি কোন ঔষধের অনুপান। তাঁহার ঘরে গুড় ভিন্ন কিছুই নাই। চিনি কিম্বা বাতাসা খুঁজিতে বাহির হইলেন। রামজয় বসুর বাড়ীতে গেলেন কিছুই পাইলেন না, শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন অন্য কিছু দিয়া ঔষধ খাওয়াইলে চলে কি না। ডাক্তার বাবু শুনিলেন মিষ্টি কিছুই পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদকে আর বলিতে হইল না। তিনিও শুনিতে পাইলেন এবং দুচারি বার চক্ষের জল ফেলিলেন।

আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানদা যখন রামজয় বসুর বাড়ীতে গেলেন, বড়গিন্নি (রামজয়ের মাতা) রামজয়ের স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন বউ দেখত সিন্দুকে কাশীর চিনি কি বাতাসা যদি থাকে তবে দাও। বউ আসিয়া গোপনে শাশুড়ীকে জানান চিনি বাতাসা অতি অল্পই আছে দিতে গেলে একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে আর জলখাবার দেওয়া চলিবে না। শুনিয়া রামজয়ের মা বলিয়া দেন "না আমাদের ঘরেও কিছুই নাই।"

রামজয় বসু আসিলেন এবং গোরাচাঁদের শয্যাপার্শ্বেই বসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গোরাচাঁদ দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়াই রহিলেন। চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারিলেন না। শেষে বলিতে লাগিলেন "আমি ত চলিলাম। আপনাকে দুট কথা বলিব বলে"—আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। আবার চক্ষে

জল মুছিয়া আরম্ভ করিলেন, "ইন্দুর সংসারে কেহই রহিল না। ওরাত ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানে না।" পুনরায় কণ্ঠরোধ হইল। অতি কষ্টে আর একবার শেষ উদ্যমে বলিলেন, "আপনি গ্রামের মাথা। যেমন আপনার নিজের ছেলের দিকে চাইবেন, তেমনি ইন্দুর দিকেও—যেন ওরা ভিটায় থাকতে পারে। আমি কিছুই রেখে যেতে পারিলাম না। যে কষ্টে আমি গেলাম তা কেবল ভগবান জানেন। ডাক্তার বাবু কতজন্মের মিত্র ছিলেন বলিতে পারি না। বোধ হয় পয়সা দিতে পারিলেও আমার এমন চিকিৎসা হইত না। হা জগদীশ্বর! একদিন আমার এই বাড়ীতে পূজার সময়ে ছোট-লোকে পর্য্যন্ত সাফ্ চিনি খাইয়াছে। আজি আমার খাবার জন্যে একটু চিনি যুটিল না। দাদা—দাদাগা!" গোরাচাঁদ আর কিছুই বলিতে পারিলেননা। এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, এই কয়েকটী কথা বলিতেই তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইল। শরীরের সমস্ত শিরা কাঁপিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন, এইবার একবার মেয়েদের এসে দেখা করিতে বলুন। জ্ঞানদাকে ডাকা হইল। সমস্ত লোক সরিয়া গেল। তিনি জানেন না যে এই তাঁহার স্বামীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ। দেখেন, গোরাচাঁদ কেবল কাঁদিতেছেন। জ্ঞানদা ছল ছল নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন?" গোরাচাঁদ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আর কাঁদছি, আমি যে চলিলাম।" জ্ঞানদা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গোরাচাঁদ বলিলেন, "তুমি এসেছ, একবার ইন্দুকে নিয়ে এস, জন্মের শোধ তার মুখখানি

দেখে যাই। বাছা আমার—দাদা, দাদাগো—দাদা, তুমি আমায় ছেলেবেলায় কত কষ্টে মানুষ করেছিলে—আর আজি আমি তোমার ইন্দুকে কি ভাবে ভাসিয়ে গেলুম একবার দেখে যাও দাদা—।" গোরাচাঁদ এবার ভয়ানক জোরে কাঁদিতে লাগিলেন। এত যে দুর্ব্বল, তবু তাঁহার ক্রন্দনধ্বনিতে গৃহ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। জ্ঞানদা কাঁদিতে কাঁদিতেও মুখে হাত দিয়া তাঁহাকে চুপ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গোরাচাঁদ জ্ঞানদার দিকে চাহিয়া আরম্ভ করিলেন, "জ্ঞানদা" বলিতেই মনের আবেগ বৃদ্ধি হইল। গোরাচাঁদ কাঁদিলেন। অনেক কষ্টে পুনরায় চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "জ্ঞানদা, ইন্দুকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিও। হায়! তোমার উপর ইন্দুর ভার!" আবার চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল। গোরাচাঁদ আর কথা কহিতে পারিলেন না। জ্ঞানদা আবার "চুপ কর, চুপ কর" বলিয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইতে লাগিলেন। গোরাচাঁদ এবার বলিলেন, "যা'তে তোমার শ্বশুরের বাস্তুতে প্রদীপ জ্বলে, ভিটাটী ছাড়িও না। কই ইন্দু কই?" জ্ঞানদার ইন্দুর [illegible] মনেই ছিল না। মনে থাকিলেও বোধ হয় তাঁহার উঠিয়া যাইবার সামর্থ্যই ছিল না। ইন্দু নিকটেই ছিল। জ্ঞানদা তাহাকে কোলে করিয়া আনিয়া কোলেই বসাইলেন। গোরাচাঁদের নড়িবার বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই; তথাপি হস্ত দ্বারায় ইন্দুর মুখটী নামাইয়া তাহাতে একটি চুম্বন দিলেন এবং আকড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে নিজের বুকের কাছে বসাইলেন, কোথা হইতে এক নূতন স্ফূর্ত্তি গোরাচাঁদের শরীরে প্রবেশ করিল। ছ বৎসরের শিশুকে যেন প্রবীণ বিবেচনায় তিনি

কথা কহিতে লাগিলেন, "বাপ ইন্দু, এই বয়সে অনাথ হলে বাবা, মা বাপ ত আগেই পালিয়েছেন, আজি যে আমিও যাই বাবা, কে তোমায় দেখ্‌বে বাবা? বাপ তুমি যেমন অনাথ হলে, তেমনি সেই অনাথনাথকে ডেকো বাবা, ভগবান অনাথ-নাথই তোমায় দেখ্‌বেন বাবা।—তোমার বংশের কেহ কখন কারও মন্দ করে নাই, তোমার মন্দ হবে না বাবা। মিত্র বংশের নাম রাখ্‌বে বাপ আমার। আর একবার মুখখানি দাও জন্মের শেষ একটী চুম খাই। আর কে তোমায় আদর করিবে বাবা! দাদা—দাদা গো—দা"—ইহার পর আর স্পষ্ট কথা বাহির হইল না।—জিহ্বা জড়াইয়া আসিল। ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিছুকাল পরেই লোকে বলাবলি করিতে লাগিল বাহির করিবার সময় হইয়াছে। ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ গোরাচাঁদের—যিনি জীবনে দাদাকেই আরাধ্য দেবতা বলিয়া মনে করিতেন তাঁহার—দাদাই মুখের শেষধ্বনি হইল। দাদাকে স্মরণ করিতে করিতেই যেন গোরাচাঁদ অন্তিম শয্যায় শয়ন করিলেন। সর্ব্বশেষে দাদা এই প্রাণভরা ডাকের কেবল অর্দ্ধেকমাত্র উচ্চারিত হইল। সম্পূর্ণ বাহির হইল না। যাঁহারা কালাচাঁদের ন্যায় অগ্রজ বা গোরাচাঁদের ন্যায় অনুজ পাইয়াছেন জগতে তাঁহারাই জানেন দাদা বোল কি মধুর!

দশম অধ্যায়।

জ্ঞানদার কর্ত্তব্য চিন্তা।

"মানসং শময়েত্তস্মাৎ জ্ঞানেনাগ্নিমিবাম্বুনা।"

গোরাচাঁদের সৎকার হইল। পল্লীগ্রামে মৃতব্যক্তির সৎকার বাধিয়া থাকে না। যাহারা জীবন সময়ে শত্রুতা করিয়াছে এ সময়ে তাহারাও বৈরভাব ভুলিয়া গিয়া মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আপনাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। গোরাচাঁদের ত শত্রুই ছিল না। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া লোকে গোরাচাঁদের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিল। জ্ঞানদা আলুলায়িত কেশে অনাবৃত মস্তকে "আমাদের কার কাছে ফেলে গেলে গো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে শবের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন। বালক ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল। সে দৃশ্য আর বর্ণনীয় নহে।

চারি পাঁচ দিন চলিয়া যাইতে জ্ঞানদা যেন একটু প্রকৃতিস্থ

হইলেন। স্নান করিবার সময় ইন্দুকে লইয়া নদীর ঘাটে গেলেই গোরাচাঁদের শ্মশানের দিকে দৃষ্টি পড়িত। অমনি তাঁহার জ্ঞান ছুটিয়া যাইত। সেখানে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ইন্দু যখন "কাকীমা বাড়ী যাবে না?" বলিয়া কাপড় ধরিত অমনি যেন তাঁহার একটু হুঁস হইত। উঠিয়া ইন্দুকে কোলে করিয়া বাড়ী আসিতেন। সংসারে একটা না একটা কিছু আশার অবলম্বন না থাকিলে মানুষ, বোধ হয়, অনেক সময়েই শোকে পাগল হইয়া যাইত। পুত্র মরিয়া গেল; পৌত্রের মুখপানে চাহিয়া গৃহস্থ আবার সংসারী হইল। স্ত্রীপুত্র সকলই গেল। ভাই ভাইপোর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। এইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তেই মানুষ একটা না একটা অবলম্বন ধরিয়া সংসারে থাকে। ইন্দু জ্ঞানদার সেই অবলম্বন। তাহার মুখের দিকে চাহিলে পতিশোকও যেন তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইত। অন্তরে নূতন চিন্তা, নূতন ভাবনা উদিত হইত। ইন্দু যখন নিকটে না থাকিত জ্ঞানদা তখন বড়ই কাঁদিতেন। প্রতিবেশিনী দুএকজন আসিয়াও তাঁহাকে থামাইতে পারিত না। কিন্তু যেমন ইন্দু কাছে আসিয়া হাত দিয়া তাহার মুখ ধরিত অমনি জ্ঞানদা চক্ষু মুছিয়া তাহাকে কোলে করিতেন। ইন্দুর চক্ষে জল থাকিলে তাহা অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিতেন এবং সান্ত্বনা করিয়া কহিতেন, "কেঁদ না বাবা।" ইন্দু বলিত, "তুমি কেন কাঁদ?" "আর কাঁদিব না" বলিয়া জ্ঞানদা তাহাকে বুঝাইতেন।

শোকের নূতনত্ব চলিয়া গেলে আধিপত্যও কমিয়া আইসে। গোরাচাঁদের মৃত্যুর পর দুতিন মাস চলিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানদা এখন আর সকল সময়েই কাঁদেন না। অন্তরে ভার থাকিলেও বাহিরে আর তেমন সর্ব্বদা প্রকাশ নাই। তিনি যেন একবারেই বুঝিয়া ফেলিলেন তাঁহার জীবনের কার্য্য ইন্দুকে মানুষ করা--যাহাতে তাঁহার শ্বশুরের বাস্তুতে প্রদীপ জ্বলে। স্বামীর সেই শেষ উক্তি যেন তাঁহার হৃদয়ে খোদিত হইয়া পড়িল। আমার যতদূর সাধ্য ইন্দুকে মানুষ করিবার—শ্বশুরের ভিটা বজায় রাখিবার—চেষ্টা করিব, জ্ঞানদা যেন এই কর্ত্তব্য একবারে সম্মুখে আঁকিয়া লইলেন। সহসাই যেন তাঁহার সংসারের অভিজ্ঞতা জন্মিল। ষোড়শবর্ষীয়া রমণী বর্ষীয়সী গৃহিণীর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানদা দেখিলেন, টাকা দেনা শোধ করিবার উপায়, তাহা আর হইবে না, এজন্য সমস্ত মহাজন বাড়ীর উপর আসিলে তাহাদিগকে বলিলেন, আমাদের যা অবস্থা দেখিতেছেন। নাবালকটী নিয়া আমি ভিটায় পড়ে আছি। আপনাদের যার কাছে যা বন্ধক আছে বেচে নিন্। যদি তাহাতে দেনা শোধ না হয়, আমি এই ঘরগুলি বেচিব। কাহারও এক পয়সা আমি রাখিব না। তবে কার কত ধারিতেন আমি জানি না, আপনাদের ধর্ম্ম; যিনি যাহা পাওনা বলিবেন, আমি তাহাই দিব।

অনেকে বন্ধকী জিনিস বেচিয়া জ্ঞানদাকে কিছু কিছু ফেঁরত দিয়া গেল। বন্ধকের জিনিস প্রায়ই ঋণের টাকার দ্বিগুণ মূল্যের হইয়া থাকে। তাহাতে আবার অনেক মহাজন একবারেই শুদ লইলেন না। কেহ বা ইচ্ছা করিয়া আসল হইতেও কিছু ছাড়িয়া দিলেন। দুএকজন দুএক টাকা বাড়াইয়া লইতেও ত্রুটি করিল না।

অতঃপর যে দুএকজন মহাজনের নিকট কিছু বন্ধক ছিল না জ্ঞানদা তাহাদিগকে কহিলেন, এই ঘরগুলির যা উচিত মূল্য হয় তা আপনারা ঠিক করুন, ক'রে আমায় বেচে দিন্। বাড়ীতে বার চৌদ্দখানি কাঁচা ঘর ছিল, কিন্তু সমস্ত ঘরেই শালের খুঁটী এবং অনেকগুলিতেই পরিষ্কার পাটার বেড়া ! সমস্তগুলি ঘরে যে ব্যয় লাগিয়াছিল তাহাতে অনায়াসেই একটী সুন্দর অট্টালিকা হইতে পারিত। কিন্তু কালাচাঁদের সমস্ত কার্য্যই একরূপ ধরণের ছিল। অট্টালিকা করিতে গেলে তাহাতে এক সময়ে কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন, তাহা কালাচাঁদের কখনই থাকে নাই। সঞ্চয় অভ্যাস না থাকিলে অধিক অর্থ কোথা হইতে আসিবে ? লোকে যদি কেহ কালাচাঁদকে কোটার কথা বলিত, তিনি উত্তর করিতেন, "হারে ভাই এখানকার কোটায় আর ঘরে এসে যায় কি ? সেখানে, পরকালে, একটু ভাল যায়গা পেলে তবেই আরাম।" সময় ভাল থাকিতে কালাচাঁদের বাড়ীর অধিকাংশ ঘরই অতিথি সন্ন্যাসী ভিখারী প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত।

জ্ঞানদা যাহাতে অল্পব্যয়ে মেরামত হয় এমন দেখিয়া তিন খানিমাত্র ক্ষুদ্র ঘর রাখিলেন। বাকি সমস্তই বিক্রীত হইল। ইহাতে জ্ঞানদার দেনা শোধ হইয়া দুএক টাকা বরং তাঁহার হাতে থাকিল। ঘরগুলি যাওয়াতে বাড়ী একবারেই শ্রীহীন হইল। আর সে মিত্রবাড়ী বলিয়া চেনা যায় না। যখন ঘর গুলি এক একখানি করিয়া ভাঙ্গা হয়, পথের লোকে দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিয়াছে; জ্ঞানদার অন্তরে যে কি কষ্ট হইয়াছে, বলা যায় না। যখন এক একখানি ঘর ভাঙ্গিবার জন্য চালে অস্ত্র

দ্বারায় আঘাত করিয়াছে, যেন এক একটী আঘাত জ্ঞানদার বক্ষে লাগিয়া এক একখানি অস্থি খসিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি বড়ই প্রখরা ছিল। তিনি ভাবিলেন, এত ঘরের এখন আর প্রয়োজন কি? অথচ আমি মেরামত করিয়া রাখি তেমন ক্ষমতা আমার নাই। ইন্দু বাঁচিয়া থাকিলে, মানুষ হইলে, কত ঘর করিতে পারিবে। গোরাচাঁদের বোধ হয় এ বুদ্ধি ঘুরিত না।

যে ভাবে জ্ঞানদা সংসার চালাইতে লাগিলেন, তাহা লিখিতে গেলেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। যে জ্ঞানদা এক সময়ে ঠিক উনুন গোড়ায় কাঠটী না থাকিলে রাঁধিতে যান নাই, এখন তিনি বাঁশ বন এবং অন্যরূপ জঙ্গল হইতে নিজে কাঠ কুড়াইয়া আনেন। দিনের বেলা পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে স্নানের পূর্ব্বে সমস্ত কাঠ একত্র করিয়া জঙ্গলের এক ধারে রাখিয়া আসেন। রাত্রে তাহা বাড়ীতে আনেন। যাহার বাড়ীর মাছ তরকারী একদিন চাকর চাকরাণীরা চুরি করিয়াছে, এখন অনেক দিনই তিনি আহারের উপকরণ নিজে বন হইতে আহরণ করেন। কচুর শাক, কল্‌মি পাতা, বেতের আগা ইত্যাদি। লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি যাহা বাড়ীতে জন্মাইতে পারিতেন তাহা বাড়ীতেই হইত। এক সময়ে আট দশ টাকা মূল্যের কাপড় যাহার অঙ্গে উঠিয়াছে, এখন তাহার আট আনা দশ আনা মূল্যের সামান্য কাপড় যুটে না। এমন সময় গিয়াছে যখন জ্ঞানদার সিন্দুকপোরা কাপড়— এখন বস্ত্রাভাবে অনেক দিন তিনি স্নানের পর গাত্রেই কাপড় শুকাইয়া লন। কাপড়ের একধারে ছিঁড়িয়া গেলে

জ্ঞানদা অপর ধার পরিতেন। ছেঁড়া অংশটী একেবারে অব্যবহার্য্য হইলে সেটুকু ছিঁড়িয়া তদ্দ্বারা গামছা করিতেন। বাকী যে টুকু থাকিত রন্ধনের সময়ে অথবা যখন অন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন জ্ঞানদা তাহাই দিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। পাড়াগাঁয়ে ইহাকে মুড়াচেরা কাপড় বলে। শৈশব হইতে এপর্য্যন্ত জ্ঞানদার অঙ্গে কখনও মুড়াচেরা কাপড় উঠে নাই, কিন্তু এখন যেন তাঁহার ইহা পরিতে কোন কষ্টই হইল না। কাপড় একবারে ছিঁড়িয়া গেলেও জ্ঞানদা তাহা ফেলিয়া দিতেন না। নিজে নিজে ক্ষারে কাচিতেন। গোরাচাঁদের মৃত্যুর পরেই জ্ঞানদা ধোবার বাড়ী কাপড় দেওয়া একেবারে রহিত করেন। কোথা হইতে আসিবে ধোবার মাহিয়ানা? সেই ক্ষারে কাচা কাপড়ের কতক অংশ ন্যাকড়া রূপে ব্যবহৃত হইত। অবশিষ্ট যাহা থাকিত তদ্দ্বারা জ্ঞানদা কন্থা প্রস্তুত করিতেন। সূচীকার্য্যে তাঁহার একটু হাত ছিল। অনেক সময়েই পরের কাপড় পরের সূতা লইয়া তিনি সুন্দর সুন্দর কন্থা করিয়া দিতেন, তাহাতে সামান্য পরিশ্রমিক মিলিত। কেহ একটী টাকা কেহবা একখানি কাপড় এই রূপ দিয়া কাঁথা সেলাই করাইয়া লইত।

জ্ঞানদার সহায়ের মধ্যে এক রঘু বর্গাইত। রঘুকে পাঠক ইতিপূর্ব্বে দুতিনবার দেখিয়াছেন। রঘু নিরক্ষর কৈবর্ত্ত। সে চিরকাল মিত্রবাড়ীতে উপকারী ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। এমন দিন নাই রঘু মিত্র বাড়ীতে না আসিয়াছে। ছেলেবেলায় ইন্দুকে কোলে করিয়া কখনও বা স্কন্ধে ফেলিয়া রঘু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিত। ইন্দুর পেটে রঘুর বাড়ীর অন্ন

খুঁজিলে দুচারিটী বোধ হয় এখনও পাওয়া যায়। যে কোন কাযে হউক না কেন ডাকিলেই রঘু আসিয়া হাজির হইত। এখনও রঘুর সেই ভাব রহিয়াছে। হাটের দিন হইলেই রঘু আসিয়া জানিয়া যাইত কিছু বেচিবার কিনিবার আছে কি না। জ্ঞানদার বাড়ীতে কতকগুলি আমগাছ, কাঁঠালগাছ, নারিকেল গাছ আর খেজুর গাছ ছিল। আমকাঁঠালের সময়ে জ্ঞানদা প্রতি হাটেই কিছু কিছু ফল দিতেন। শীতকালে রঘুনাথ খেজুর গাছ গুলি কাটিয়া দিত। জ্ঞানদা রস জ্বালাইয়া গুড় করিতেন। নারিকেল গাছের ডাল যাহা পড়িত জ্ঞানদা রাত্রে রাত্রে তাহার পাতা ছাড়াইয়া খেঙ্গরা কাঠি করিয়া রাখিতেন। যে দিন যাহা থাকিত গোপনে রঘুনাথ আসিয়া লইয়া যাইত। এত যে কষ্ট তবু বাড়ীর কিছু বেচিতে হইলেই লুকাইয়া দিতে হইবে। হায় রে সামাজিক লজ্জা! দীন দুঃখী ভদ্রলোক উপবাস করিয়া থাকিলেও তোমার ভয়ে ভীত। শরীরে সামর্থ্য থাকিলেও তুমি তাহাকে খাটিতে দিবে না। বাড়ীতে শাপাকুড় প্রচুর থাকিলেও তুমি তাহাকে বেচিতে দিবে না। রাস্তাদিয়া এক ঘটী দুধ হাতে করিয়া আনিলে তুমি চোক রাঙ্গাইবে। আবার কিন্তু একটী ব্যাগে করিয়া পরের জুতা বহন করিলেও তুমি কিছু বলিবে না। যার ব্যাগ বাক্স কিছুই নাই, তার পক্ষেই তুমি যম। জ্ঞানদার কষ্ট যে তুমিও কিয়ৎ পরিমাণে বাড়াইয়াছ তাহার আর সন্দেহ নাই। সাধে কি গোরাচাঁদ একদিন কাঁদিয়াছিলেন যে, ভদ্র লোকের ছেলে না হইয়া চাষার ঘরে জন্মিলে ছিল ভাল, তাহা হইলে শরীর খাটাইয়া খাইতে পারিতাম।

জ্ঞানদা কিরূপ ভাবে সংসার চলাইতেন এক রঘু ভিন্ন
ামের অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিত না। রঘু জ্ঞানদার
াথায় ব্যথিত ছিলেন এজন্যে তিনি তাহাকে কিছুই লুকাই
তন না। কিন্তু তথাপি এমন দুএকদিন গিয়াছে যে জ্ঞানদার
রে কিছুই নাই। ইন্দুকে কিছু খাওয়াইয়া নিজে উপবাস
রিয়া আছেন রঘু তাহা জানিতে পারে নাই। জ্ঞানদার
ভাবই এই যে সাধ্যমত নিজের দুঃখ পরকে জানাইবেন না।
গোরাচাঁদের মৃত্যুর পর কেহ কখনও জ্ঞানদাকে কাহারও
নিকট কিছু যাজ্ঞা করিতে দেখে নাই।

গ্রামের অনেকেই মনে করিয়াছিল যে জ্ঞানদা ইন্দুকে লইয়া
হয় নিজের বাপের বাড়ীতে, না হয় ইন্দুর মামার বাড়ীতে
গিয়া থাকিবেন। কিন্তু এখন তাঁহার সংসার চালান দেখিয়া
সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিল। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে
জ্ঞানদার পিতৃকুলে এক ভাই আর ইন্দুর মাতামহ কুলে এক
মাতুল ছিলেন। ইহা ছাড়া মোক্ষদার শ্বশুর। তাঁহার সহিত
পাঠকের পরে পরিচয় হইবে। জ্ঞানদার ভ্রাতার নাম হরচন্দ্র
ঘোষ। তিনি সামান্য গৃহস্থ; ইহাঁর পিতার বেশ বিভব ছিল,
কিন্তু হরচন্দ্র নিজের বুদ্ধির দোষে প্রায় সমস্তই খোয়াইয়াছেন।
জ্ঞানদাকে লইয়া যাইবার জন্যে তিনি বার বার জেদ্ করেন।
কিন্তু জ্ঞানদা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে শ্বশুরের
ভিটা বজায় রাখিতেই হইবে। হরচন্দ্র কিছু চটা স্বভাবের
লোক ছিলেন। ভগ্নীকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া যখন তাঁহার কথা
টিকিল না তখন বলিয়া গেলেন, "আর আমি তোর নামও করিব
না; তুই তোর শ্বশুরের ভিটায় পড়ে ছাই খা।" যেমন

কপাল।” বাস্তবিক বাড়ী হইতে কিছু সাহায্য পাঠাইয়া দেন এমন অবস্থা হরচন্দ্রের এখন নাই। ইন্দুর মাতুল শিবচন্দ্র বসুর অবস্থা অনেক ভাল। উন্নত বলিলেই চলে। জমিদারের সরকারে বিশটাকা বেতনে তাঁহার চাকরি। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি হইয়া থাকে। গোরাচাঁদের শ্রাদ্ধের সময়ে ইনি পাঁচটী টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ইন্দুকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া লেখা পড়া শিখান; গ্রামে পাঠশালাও আছে। কিন্তু ভয় তাঁহার গৃহিণীর। শিবচন্দ্র বড়ই স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর স্বভাব অতিশয় উগ্র এবং মন বড়ই ক্রূর ছিল। গোরাচাঁদের মৃত্যু সংবাদ পাইবার পরেই শিবচন্দ্র এক দিন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, “ইন্দুকে এখানে এনেই রেখেদি।” তাঁহার স্ত্রী উত্তর করেন, “ভুঁই অভাবে ভাগাড় চষে, আর মানুষ অভাবে ভাগনে পোষে। ভাগনের মতন অমন নেমকহারামজাত আর আছে? ঘরে ভাত ধরে না?” শিবচন্দ্র আর কিছু না বলিয়া কেবল কহিলেন, “পূজার সময়ে একবার তাকে আর তার খুড়িকে আস্‌তে বলব; সে সময়ে কত বাজে লোকেও ত এসে খায়।” সীমন্তিনী ইহাতেও মুখ বাঁকাইলেন কিন্তু ফুটিয়া কিছু বলিলেন না। শিবচন্দ্র ইহাতেই বোধ হয় মনে মনে গুণবতী স্ত্রীকে কত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। পবিত্র প্রণয়পীযূষপায়ী সৎপুরুষেরা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর দাসত্ব করিয়াও স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে মূর্খেরা ইচ্ছা করিয়া প্রেতস্বভাবা কামিনীর নিকট আপনার মনুষ্যত্ব বিকায় জগতে তাহাদের ন্যায় নরাধম আর কে আছে?

একাদশ অধ্যায়।

ইন্দুর মাতুলালয়।

"অবলা প্রবলা যত্ন * * * *
* * * * বিঘ্ন স্তম্ভ পদে পদে॥"

শিবচন্দ্র বসুর ওলপুরে বাড়ী; ওলপুর ফতেপুর হইতে চারি ক্রোশ অন্তরে। আজি দুর্গোৎসবের সপ্তমী পূজা। শিববাবুর বাড়ীতে বেশ ধূম। বেলা প্রহরেক অতীত হইয়াছে। পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আঙ্গিনার এক পার্শ্বে ঢাকী ঢাকস্কন্ধে দাঁড়াইয়া আছে। মন্ত্রের বিরাম হইলেই একবার ড্যাং ড্যা ড্যাং করিয়া উঠিতেছে। মাঝ উঠানে বাড়ীর এবং পাড়ার সমস্ত বালক একত্র হইয়াছে। সকলেরই নূতন পরিচ্ছদ। শিব বাবুর বড় ছেলে নলিনীকান্ত ইন্দুর সমবয়স্ক। তাহার পায়ে নূতন জুতা। পরিধান সিমলার কলপ দেওয়া ধুতি। গায়ে একটী

নূতন সাটিনের জামা, গলায় একখানি পাড়দার কোঁচান চাদর। ইন্দুও সেই সঙ্গে আছে। একখানি বিলাতী কাপড় আর বিলাতী চাদর মাত্র তাহার অঙ্গে রহিয়াছে, জুতা জামা কিছুই নাই। বালক যেন এ পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছে। অন্যান্য ছেলেরা যেমন ছুটাছুটী করিতেছে ইন্দুর তেমন নাই। অন্যে খেলিতেছে, ইন্দু তাহাতেও যোগ দিতেছে না। বৈঠক-খানায় যুবকদিগের তাস খেলা চলিয়াছে। ইন্দু মধ্যে মধ্যে সেখানেও উঁকি মারিতেছে। ইন্দু ত তাস খেলা জানে না। তবে তাহার যুবকদিগের নিকটে যাইবার এত আগ্রহ কেন?

কে এক বৃদ্ধ পাল্‌কী করিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। অমনি তাস খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। কেহ হাতের তাস গুলি পশ্চাতে লুকাইলেন, কেহবা হুঁকাটী অন্যের হাতে দিলেন। "তামাক দে," "তামাক দে" শব্দ হইল। বাড়ীর ভিতরে খবর গেল স্বরূপ দত্ত আসিয়াছেন। শিবচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। স্বরূপ উত্তর অঞ্চলে চাকরি করিয়া প্রভুত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। এখন বৃদ্ধাবস্থায় বাড়ীতেই থাকেন। কালাচাঁদ মিত্রের সহিত ইহার বড় সৌহার্দ্দ ছিল।

স্বরূপ দত্ত আসিয়াছেন শুনিয়া জ্ঞানদা তাঁহাকে দেখিবার জন্যেই হউক অথবা ইন্দুকে দেখিয়া তিনি কি বলেন জানিবার জন্যেই হউক বাহির বাটীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বরূপ শিবচন্দ্রকে দেখিয়াই কহিলেন, "কই কালাচাঁদ মিত্রের ছেলেটা?" শিবচন্দ্র "এই যে" বলিয়া ইন্দুকে ডাকিলেন। শুষ্কমুখে ধূলিপায়ে ইন্দু যাইয়া স্বরূপের কাছে দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়াই স্বরূপ চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। একটু বাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জুতা নাই?" বালক কাঁদ কাঁদ মুখে উত্তর করিল "না"। স্বরূপ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, পূজার সময়ে মামার বাড়ীতে কাপড় পাও নাই? "এই যে" বলিয়া ইন্দু পরিধান ধুতি এবং চাদর দেখাইয়া দিল। স্বরূপের মনে বড়ই কষ্ট হইল। শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ছি, শিব বাবু, এই ছেলেকে এই কাপড় দিতে আছে? এ সময়ে লোকে কত অপরকে দেয়। যে মানুষের ছেলে ও! কালাচাঁদ মিত্র পূজার সময়ে কত লোককে কাপড় বিলাইয়াছে তাহার ঠিকই ছিল না। হা ভগবান"! চক্ষু মুছিয়া স্বরূপ ইন্দুকে কোলে লইয়া কহিলেন, "বাবু, আমি এক যোড়া কাপড় দিব পরিবে?" বালক ছল ছল নেত্রে উত্তর করিল, "আমার কাকী মার কাছে দেবেন।"

স্বরূপ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইন্দুর মুখে একটী চুম্বন দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সভাস্থ সকলের চক্ষেই জল আসিল। শিবচন্দ্র দুঃখে এবং লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। বস্তুতঃ তিনি ইন্দুর জন্যে নলিনের ন্যায় দেশী কাপড় চাদরই আনিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন "ও কাপড় ওর কদিন যাবে? যা দুদিন ট্যাকে এমন দেখে এখানকার বাজার থেকে ওকে এক যোড়া মোটা কাপড় এনে দাও। ও যোড়া আমার নলিনের থাকুক।"

জন্মজন্মান্তরের পুণ্যবল না থাকিলে কি এমন সুপরামর্শদাত্রী স্ত্রী যুটে?

ইন্দু বাহিরে আসিবার পরেই একটী লোক আসিয়া

চেঁচাইতে লাগিল, "ওরে ছেলেরা, তোরা এসে সব ভাঁড়ার থেকে জল খাবার নে। ভাতের এখন অনেক দেরি।" সকল ছেলেই দৌড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুও গেল।

ভাণ্ডারী মহাশয় একজন ভদ্রলোক। শিব বাবুর শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কীয়। আবার শিব বাবুর অধীনেই তাঁহার চাকুরি। শিব বাবুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বৎসর বৎসর ইনি নিজে এই কার্য্যের ভার লইয়া থাকেন। তিনি নলিনীকে ডাকিলেন। ইন্দুও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। ভাণ্ডার রক্ষক নলিনীকে কতকগুলি মুড়কী আর একটী সন্দেশ দিলেন। "আর কিছু চাই" বলিয়া জিজ্ঞাসা করায় নলিনী না বলিল। ইন্দুর বেলায় ততগুলি মুড়কী কিন্তু ভাঙ্গিয়া আদ্‌খানি সন্দেশ দিলেন। ইন্দু যেন একটু রাগ ভরেই জিজ্ঞাসা করিল, "ওকে দিলে একটা, আর আমাকে আদ্‌খানা কেন?" ভাণ্ডারী বাবুটী একটু মুখ নীচু করিয়া কহিলেন, "ও আর তুমি কি সমান?" সাত বৎসরের বালকের অন্তরে এই কয়েকটী কথা যেন বড়ই জো[illegible] প্রবেশ করিল। এরূপ ব্যবহার ইন্দু এই প্রথম দেখিল অভিমানের একশেষ হইল। মুড়কী সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া সে যাইয়া একবারে কাকীমার কাছে উপস্থিত হইল। জ্ঞানদা বাড়ীর মধ্যে এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ঘরে থাকেন। ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে কহিল, কাকীমা ভাঁড়ারে গিয়াছিলাম জল খাবার আনিতে, নলিনীকে দিলে একটা সন্দেশ আমাকে আদখানি, আর বলে কি যে ও আর তুমি কি সমান? জ্ঞানদা ইন্দুকে কোলে লইয়া অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,

"ওদের যে বাড়ী, কাযেই বলেছে ও আর তুমি কি সমান?" জ্ঞানদার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইন্দুও কাকীমার কোলে মস্তক লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক যেন নীরবে তাহার আপনার অবস্থা ভাবিতে লাগিল। যেন আপনিই বুঝিয়া লইল নলিনী আর সে সমান নহে। সংসারে ইতর বিশেষ আছে। কাকীমা যখন বলেছেন সমান নহে, তখন নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে। এই ঘটনার পর হইতেই ইন্দুর মনে এক নূতন জ্ঞান জন্মিল। তাহার স্বভাবে প্রবীণত্ব প্রবেশ করিল। আর এক দিনের জন্যেও আমরা কখনও ইন্দুকে কোন আবদার করিতে দেখি নাই।

ইন্দু তখনও জ্ঞানদার কোল হইতে মস্তক উঠায় নাই এমন সময়ে একটী লোক সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া স্বরূপ দত্ত ইন্দুকে এই কাপড় দিয়াছে বলিয়া এক যোড়া দেশী কাপড় ও চাদর জ্ঞানদার কাছে ফেলিয়া দিয়া গেল। সাদরে কাপড় যোড়াটী গ্রহণ করিয়া জ্ঞানদা নীরবে জগদীশ্বরের নিকট স্বরূপের মঙ্গল কামনা করিলেন। শিবচন্দ্র, তোমার ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া উঠিলনা। তোমার হিতার্থে এই অনাথা বিধবার প্রার্থনা সেই সর্ব্বশক্তিমানের কাণে গেল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ইন্দুর মাতুলানী।

"ন কেনচিৎ বিবদেদপ্রলাপবিলাপিনী।"

অষ্টমী নবমী পূজা হইয়া গেল। আজি বিজয়া। ভাসানের দিন সর্ব্বত্রই সমান আমোদ। বেলা দুই প্রহরের পর হইতে সকলে নদী তীরে ধাবমান হয়। এক এক করিয়া প্রতিমা আসে। নদীতে নৌকার বাচ্ হয়। কলিকাতার হর্স রেচ্ দেখিয়া যাহারা আমোদ পান, মফস্বলের নৌকার বাচ্ দেখিলেও বোধ হয় তাদের খুসী ধরে না। উপরে আড়ং বসে। আড়ং সংসার বিপণির পরিস্ফুট প্রতিমূর্ত্তি। বেলা দুই প্রহরের সময়ও কোথায়ও কিছু নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যে নদীতটে বিপণি মালা সজ্জিত হইল। কত কেনা বেচা, কত ছুটাছুটি, কত গণ্ডগোল। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে কিছুই নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। যে যাহার বাড়ী

লিয়া গেল। যে থালি মাঠ সেই থালি মাঠই পড়িয়া রহিল। ছেলেদের বড়ই আমোদ। কেহ বাঁশী কিনিবে, কেহ মোওয়া খাইবে, কেহ পট্‌কা ছুড়িবে, কেহ বা নাগরদোলায় উঠিবে। যার যে সখ যায় সে তাই করিবে।

বেলা তিনটার সময় শিব বাবুর বাড়ীর প্রতিমা বাহির হইল। ছেলেরা কাপড় চোপড় পরিয়া সাজিতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিয়ম এই যে এ দিনে চাকর বাকরকে পর্য্যন্ত আড়ং খরচ বলিয়া কিছু কিছু পয়সা দিতে হয়। শিবচন্দ্র ইন্দুকে চারি আনা পয়সা দিলেন। ইন্দু তাহাতেই মহাখুসী। নলিনী কত পাইল সে তাহা খোঁজও করিল না। ইন্দু বাহির হইবে এমন সময়ে শিবচন্দ্রের স্ত্রী কহিলেন, "ইন্দু ঐ যে নলিনের একযোড়া পুরাণ জুতা আছে ঐ পায়ে দিয়ে যাও। খালি পায়ে গেলে আবার কত মিনসের চোকে ব্যথা হবে এখন। ওরে ব্যথা! বলে—'মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর আর ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়সী' তাই। কার সর্ব্বনাশ আমি করেছি, কার বুকের উপর উনুন খুঁড়ে ভাত রেঁধে খেয়েছি বলিতে পারি না, যে যাতে আমার দু পয়সা ওড়ে গ্রামের লোকের কেবল সেই চেষ্টা। সব আদর কাড়াতে আসেন। যার অত প্রাণ কাঁদে, সে নিজে দিলেই পারে, পরকে বলিতে আসে কেন?"

জ্ঞানদা পার্শ্বের ঘরে থাকিয়া সমস্ত শুনিতেছেন। বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে দিন স্বরূপ দত্ত ইন্দুর কাপড় লইয়া যে দু একটী কথা বলিয়াছেন তাহারই প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতেছে। কথা কহিলেই ঝগড়া বাধিবে এই ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ইন্দু মামীর অসম্বদ্ধ আখ্যায়িকার অর্থ

কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কেবল জুতা পরিবার আদেশটী মাত্র তাহার প্রতি ধরিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া পায়ে জুতা দিতে গেল। দেখিল জুতা যোড়াটী একবারেই ছেঁড়া। উপরের ছেঁড়ায় তত ক্ষতি করিত না। কিন্তু তলাটী প্রায় খসিয়া গিয়াছে। পা তুলিলে জুতার উপরিভাগ তাহার সঙ্গে উঠে বটে, কিন্তু তলা যেন যাইতে চা না। দুই তিনবার চেষ্টা করিয়া ইন্দু কহিল, "এ যে একেবা ছেঁড়া, এ পায়ে দেওয়া যাবে না। যাই আমি খালি পায়েই যাই সিয়া ইন্দু ঘর হইতে বাহির হইল। শিবচন্দ্রের স্ত্রী আবার আর করিলেন,—এ দিকে নাই ছাই এক কুলো, কিন্তু নবাবী টুকু আছে। দিলুম এক জোড়া জুতা তা আবার ছেঁড়া বলে পরা হল না! কে ওঁর জন্যে নূতন জুতা কিনে রেখে দিয়েছে। সে দিন এক ভাঙ্গা সন্দেশ খাব না বলে কি কাণ্ডটাই না ক । ভাণ্ডারী মহাশয়কে বেকুব বানালে। হতভাগা ছেলে. ন কপাল তেমনি বুদ্ধি। যেমন কেউ কোথায়ও নাই, ন যা পাস, তাই খা; যা দি তাই পর; তা না।—জ্ঞানদা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "ও ত আর জুতা চায় নি, তুমিই ডেকে দিলে।"

শিবচন্দ্রের স্ত্রী। হাঁ লো হাঁ, ওলো তোর পোড়ে কেন? তোকে কে কি বলেছে?

জ্ঞা। আমার লাগে বলেই বল্‌ছি। মিছামিছি ছেলেটাকে গাল দিচ্চ; এতক্ষণ ত কিছুই বলি নাই।

শি, স্ত্রী। বল্‌বি কি লো, হ্যাঁ ওঁর বড় দরদ কিনা—ওলো আমার দরদি, এসেছেন কুঁড়ে খেতে, আবার লম্বা লম্বা কথা দেখ।

জ্ঞা। আমরা কালই যাব।

শি, স্ত্রী। যাবে কেন থাক না। এসেছিলে যে পাটরাণী হতে, পিরীত কর্ত্তে, যুটলো না বুঝি? সে দিন যে মিন্সের সঙ্গে কত কথা বলছিলি। হল না পিরীত? আবার দাদা দাদা বল্লে কতই রঙ্গরস করে ডাকা হয়। ওঁর সাত পুরুষে দাদা। মরণ আর কি! অত বড় বয়সের মাগী, তার লজ্জাও নাই—সরমও নাই—গলায় দড়ি!

জ্ঞানদা কেবল "লজ্জা পরমেশ্বর ঘুচিয়েছেন, নতুবা তোমার বাড়ীতে আস্‌ব কেন? আমিও এক বাড়ীর বউ ছিলাম" এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শিবচন্দ্রের স্ত্রীর তখনও নিবৃত্তি নাই। জ্ঞানদার প্রতি আরও দুচারিটী অকথ্য শব্দ প্রয়োগ হইল। জ্ঞানদার মনের আবেগ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তিনি আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কেবল চেঁচাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিবচন্দ্র-গৃহিণীও একটু চাপিয়া গেলেন। জ্ঞানদার ক্রন্দনের বেগ থামিলেই আবার আরম্ভ করিলেন, "বালাই জঞ্জাল—বালাই জঞ্জাল সব আমার কপালে এসেই যুটে। আজি বছরকার একটা দিন—তাতে বাড়ীর উপর এই কান্নাকাটী। এত কি সওয়া যায়? যার অমন ঠাট্‌ দেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে আলাদা বাড়ী করে দিয়ে দেখুক গিয়ে। আমি অত বরদাস্ত করিতে পারিব না। আন্‌বি বাবু এক ভাগনেকেই আন্—তা না আবার তার সঙ্গে সঙ্গে এক নেজুড়।"

পাঠক, উপরে নারীধর্ম্মের যে উপদেশ লিখিত হইয়াছে, শিবচন্দ্রের স্ত্রী তাহা কেমন পালন করিতেছেন?

জ্ঞানদা আর জিহ্বাটীও নাড়িলেন না। ইন্দু ফিরিয়া

আসিলে তাহাকে কহিলেন "কাল চল বাড়ী যাই।" ইন্দুর তাহাতে কোন আপত্তিই ছিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া জ্ঞানদা ও ইন্দু ফতেপুর যাত্রা করিলেন। জ্ঞানদা শিবচন্দ্রের সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না। শিবচন্দ্র ইন্দুকে ডাকিয়া কহিলেন, "ইন্দু তোমার কাকীমার একখানা কাপড় নিয়ে যাও।" পরে একটী থান ফাড়িয়া এক মাগী চাঁড়াল চাকরাণীকে একখানি আর ইন্দুর হাতে একখানি কাপড় দিলেন।



ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জ্ঞানদার গৃহে প্রত্যাগমন।

"বরং প্রাণত্যাগো নপুনরধমানামুপগমঃ।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞানদা মনে মনে স্থির করিলেন, ভিটায় পড়িয়া না খাইতে পাইয়া মরি সেও ভাল। আর কখনও পরের দুয়ারে যাইব না। বুঝিলেন সংসারে গরীবের আদর নাই। জ্ঞানদার ভাল অবস্থা থাকিলে শিবচন্দ্র বসুর সাহস হইত না যে, তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইতে চান। এখন এক প্রকার যাচিয়া সেখানে গিয়া এত অপমান। শিবচন্দ্রের স্ত্রীর কর্কশ কথাগুলি জ্ঞানদার মর্ম্মে বাজিয়াছে। জ্ঞানদা যতদিন জীবিত থাকিবেন, বোধ হয় সে বাক্যগুলি তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ থাকিবে। জ্ঞানদা বাড়ীতে আসিয়াই রঘুকে দেখিলেন। যে কদিন তাঁহারা বাড়ীতে ছিলেন না রঘু ও তাহার একটী ছেলে বাড়ীটী পাহারা দিয়াছে। দু

এক কথার পর রঘু জিজ্ঞাসা করিল কেমন আদর করিয়াছে? জ্ঞানদা চক্ষের জল ফেলিলেন। ইহাতেই রঘুর প্রশ্নের উত্তর হইল। সে কহিল "খুড়ী ঠাকরুণ, সংসারের গতিকই এই।"

জ্ঞা। আমি মনে করিয়াছি আর কোথায়ও যাইব না। আর যাবার যায়গাই বা রইল কোথায়?

র। তা নাই গেলেন।

জ্ঞানদা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "রঘু—আমাদের চল্‌বে কিসে?"

র। জগদীশ্বর চালা'বেন। তিনি সকলেরই সহায়।

জ্ঞা। তিনি না রাখিলে কি আর এতদিন থাকিতাম?

র। যা ধান আছে এবার আপনাদের কবন্দ জমিতে, এখন যেমন খরচ কম তাতেই বছর চলে যাবে।

জ্ঞা। এত ধান কি হবে?

র। বেশ ধান আছে এবার; বামুনের দরুণ জমিতে। আমি এবার থেকে আর ধানের ভাগ নেব না।

জ্ঞা। সেও কি কথা? তোমার চলিবে কিসে?

র। আমার ঢের চলিবে। আপনার আশীর্ব্বাদে এখন আমার দুটী ছেলে কাজের নায়েক হয়েছে। এবার আমি প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি ভাগে নিয়েছি। একখানা হাল বাড়াইয়াছি।

জ্ঞা। এত খেটে তুমি ভাগ নেবে না তাও কি হয়?

র। কত খেয়েছি আপনাদের। আমার হাল গরু যা কিছু সবই ত এই বাড়ীর কৃপায়। সেবার চল্লিশ টাকা নিয়ে দুটী গরু কিন্‌লাম, ছোট কর্ত্তা বলিলেন, "রঘু তুই এর কুড়ী টাকা দিস্।" সেই কুড়ি টাকাই কি দেওয়া? তিন বছর ধান

য়ে দিয়ে শোধ করি। একটী পয়সাও শুদ দেই নি। কি বছরে মামার পূজার কাপড়, শীতের কাপড়। সবকি মনে আসে? মারে দিন!

জ্ঞা। রঘু তুমি ছিলে বলেই আমি এতদিন ভিটায় আছি। আমি প্রকৃত উপোস করে পড়ে থাক্‌লেও এসে মুখের কথাটী জিজ্ঞাসা করে গ্রামে আর এমন লোক নাই। ও বাড়ীর বড় কর্ত্তাকে দুখানি হাত ধরে কত করে বলে গেছ্‌লেন্ জান ত? এখন এমন যে মরে গেলেও একবার জিজ্ঞাসাটা নাই। আরও দেখ্‌তে পাই যে ইন্দু ওঁদের বাড়ীতে লিখ্‌তে যায়, ওঁর ছেলের চেয়ে লেখে ভাল, তাতেও একটু হিংসা হিংসা ভাবটা।

র। ও বড়কর্ত্তা মেজকর্ত্তা সব সমান। ও বংশের কে কবে পরের ভাল করেছে, বা পরের ভাল দেখ্‌তে পেরেছে। রামজয় ত পাপের হাঁড়ি। ওর উপর যদি আমার একটুকুও ভক্তি থাকে। ভাই গিরি ত কায়েতের ঘরের ঢেঁকি। তিনি আবার লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ বই করেন না। সব কথা আপনাকে বলি না আপনার মনে দুঃখ হবে বলে। শ্রাবণ মাসে আপনার কাছ থেকে কাঁঠাল আর আমসত্ত্ব নিয়ে বেচে দিতুম। একদিন হাটে দুটী কাঁঠাল আর খান কয়েক আমসত্ত্ব নিয়ে বসে আছি—আমি ত সেই তরকারী হাটার এক কোণে মুখটী ঢেকে বসে থাকি—সেখানে গিরি বসু যেয়ে যে কতই ঠাট্টা আরম্ভ কল্লে—আমার প্রাণ ফেটে যেতে লাগিল। টের পেয়েছে যে এগুলি আপনার বাড়ীর জিনিস—আমার বাড়ীতে ত একটা জাম গাছ, গুটি কতক পেয়ারা গাছ ভিন্ন আর ফলের গাছই নাই—তাই বল্‌ছে কি, কি রঘু তোমার ত বড় কপাল

দেখ্‌ছি ! জাম গাছে আম কাঁঠাল ফল্‌তে সুরু হয়েছে ! আমি চুপ করিয়া গেলাম।

জ্ঞা। যিনি যেমন দেখেন ভগবান জানিবেন।

রঘু অনেকক্ষণ থামিয়া বলিল, আচ্ছা ইন্দু দাদাকে এক এক বার দিদির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে হয় না ?

রঘু আহ্লাদ করিয়া ইন্দুকে বরাবর ইন্দু দাদা বলিত।

জ্ঞানদা কহিলেন, কার—মোক্ষদার কথা বল্‌ছ ?

র। হাঁ।

জ্ঞা। কি জান রঘু, অবস্থা খারাপ হলে কারও বাড়ী যাওয়াই পোষায় না। যখন সময় ভাল থাকে আত্মীয় কুটুম্বের কাছেও আদর থাকে। সময় খারাপ হলে কেহই যাওয়া আসা ভাল বাসে না। দেখ্‌লেত এই এক যায়গায় গিয়েছিলুম। যে মনঃকষ্টটা পেয়েছি তা আর মলেও ভুলিব না। তাই ভয় হয় যদি মোক্ষদার বাড়ীতে গেলে আমার ইন্দুকে ছু বলে তা আর প্রাণে সহ্য হবে না। তাতে শুনেছি কদার শ্বশুর যে কৃপণ, সকাল বেলা লোকে তাঁর নাম ক.র না, বলে তাঁর নামে বঙুন কাটে।

র। তা দিদি কিছু কিছু দিতে পারেন, অতবড় ঘরের বউ, অবশ্যই তার হাতে দুএক পয়সা থাকে।

জ্ঞা। হারে কপাল! তার যে গঞ্জনা শুনতে পাই—সবই তার শ্বশুরের হাতে—সে বউ মানুষ, সারাদিন খেটে মরে, দুটী খেতে পায়। তার শ্বাশুড়ী বড় দুরন্ত। তারই হাতে কিছু থাকিলে থাকিতে পারে।

র। বুড়া চক্ষুলজ্জার খাতিরেও কিছু সাহায্য করিতে

ারে। একমাসে দুমাসে এক এক বার গেলে কিছু কিছু াবেই। এ বাড়ীতে ত অনেক বার এসেছে, আর দেখেছে া কত লোক অন্ন পেয়েছে।

জ্ঞা। এ বাড়ীর কথা ছেড়ে দাও। তেমন না হলে আর াথের ভিখারী করে রেখে যাবেন কেন? এখন কি তার একটী লোককেও দেখ্‌তে পাও? সব যেন পরামর্শ করে পালিয়েছে।

র। সংসারের ভাবই এই। সে দিন হাটে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হল। ও বোধ হয় বার বছর ধরিয়া এই বাড়ীতে থেকেছে, খেয়েছে, পরেছে, কত নিয়েছে। ইচ্ছা নয় যে আমার সঙ্গে কথা কয়। চোকোচোকি হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ভাল আছেন কবিরাজ মহাশয়? তখন যেন লাজে পড়ে জিজ্ঞাসা কল্লে, মিত্রদের বাড়ীর সব এখন কেমন আছে? আমি বলিলাম ভগবান যেমন রেখেছেন। আর না রাম না গঙ্গা।

জ্ঞা। তাত হবেই। তাতেই আমি বল্‌ছিলেম যে, মোক্ষদার শ্বশুর বাড়ীতে গেলেও তারা যে বড় ভাল দেখ্‌বে তা নয়। সময় ভাল থাকিলে যত্ন করিত। লোকে বলে "ধনীর মাথায় ধর ছাতি; নির্ধনের মাথায় মার লাথি।"

ক্ষণেক থামিয়া জ্ঞানদা বলিলেন, তা তুমি বল্‌ছ নে যাও ইন্দুকে এক বার, দেখ কেমন ব্যবহার করে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নিধিরাম ঘোষ।

"ধনেন কিং যোন দদাতি যাচকে।"

মোক্ষদার শ্বশুরের নাম নিধিরাম ঘোষ। বাড়ী নসিপুরে। নসিপুর ফতেপুরের তিন ক্রোশ উত্তরে। নিধিরামের একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র ঘোষ। নিধিরাম দেশ প্রসিদ্ধ কৃপণ। অর্থ প্রচুর, কিন্তু সদ্ব্যয় মাত্র নাই। নিধিরামের নাম করিলে সে দিন অন্ন হয় না বলিয়া লোকের ধারণা। চারুচন্দ্রের সহিত এখনও সংসারের কোনই সংস্রব নাই, অথচ কেবল নিধিরামের পুত্র বলিয়া লোকে তাহারও নাম করে না। গ্রামের লোকের বিশ্বাস এমনই বদ্ধমূল যে বালকেরা পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পায় যে, ঘোষেদের বাড়ীর কাহারও নাম ধরিতে নাই। আমরা শ্রুত আছি একবার একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক নসিপুরের পাঠশালা দেখিতে আসেন। প্রথম শ্রেণীর

বালকদিগকে, “সাহিত্য কি পড় ?” জিজ্ঞাসা করায় “সীতার বনবাস, অমুকপাঠ তৃতীয়ভাগ” ইত্যাদি বলিয়াছিল। অমুক পাঠ কোন পুস্তকের নাম নাই। পরিদর্শক বুঝিতে না পারায় বালকেরা তাঁহার হস্তে একখানি চারুপাঠ তুলিয়া দেয়, তথাচ সম্পূর্ণ নামটী করে নাই। এ ছাড়া চারুঘোষের মার কথা উঠিলে তাহারা “মারু ঘোষের চা” এবং তাহাদের একটী গরু দেখিলে “গারু ঘোষের চরু” বলিত। নিধিরামের নামটী এতই ঘৃণ্য যে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়াও তাহারা কখনও উহা জিহ্বাগ্রে আনিত না।

ফাল্গুন মাস। অল্প অল্প শীত আছে। সকাল বেলায় বৃদ্ধেরা গায়ে কাপড় না দিয়া থাকিতে পারেন না। নিধিরাম— আমাদের নামটী না লিখিয়া উপায় নাই—পাঠক যদি আহারের পূর্ব্বে এ অংশটী পড়েন তাহা হইলে উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে বানান করিয়াই সারিবেন—সকালবেলায় একখানি প্রপিতামহের আমলের বালাপোষ গায়ে দিয়া চট পাতিয়া রৌদ্রে বসিয়া পাট কাটিতেছেন। পাড়ার আর একটী বৃদ্ধ রাজনারায়ন দাস সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে। নিধিরামের কোমরে এক প্রকাণ্ড লৌহের চাবি ঝুলিতেছে। দক্ষিণ হাঁটুর নীচে একটী বাঁশের চোঙ্গা, তাহাতে তামাক রহিয়াছে। বাম পার্শ্বে একখানি মালসায় ঘুঁটের আগুন; নিকটেই একটী হুঁকা এবং কলিকা রহিয়াছে। নিধিরামে রাজনারায়ণে গল্প চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উভয়ে তামাক ফুঁকিতেছেন। পাছে তাঁহার অজ্ঞাতে কেহ একটুকু তামাক খায় এই ভয়ে নিধিরাম সমস্ত তামাকের চোঙ্গাটী সারাদিন নিজের এক্তারে রাখেন। রাত্রিতে আহা-

দির পর তাহা সিন্ধুকে উঠে ; যে সিন্ধুকে নিধিরামের সর্ব্বস্ব এবং যাহার চাবি তাঁহার কোমরে দোদুল্যমান। তাঁহার না তাহার বলিব। এমন লোকের সর্ব্বনামে একটা চন্দ্রবিন্দু দিতেও কেমন বাধ বাধ লাগে। তবে বয়সটা বেশী।

নিধিরাম কথা আরম্ভ করিয়াছেন—

হারে ভাই আর সংসার চলে না। ছেলে ব্যাটা হয়েছেন এক বাবু। আবার ঘরে যে বউটীকে এনেছি তিনিও বাবুর ধাক্কা।

রা। কেন কালাচাঁদ মিত্রের মেয়ে না? ওদের ত বড় সদ্বংশ।

নি। সেই সদ্বংশ বলেই ত যত গোল। ফতেপুরের মিত্র—ওরা সাত পুরুষ একভাবে কাটিয়েছে। কোন পুরুষেরই কেউ একবারে মূর্খ হয় না! পয়সাও আনে, খায় দায়, লোককে খাওয়ায় দাওয়ায় শেষে মরিবার সময়ে ফতুর। একটা পয়সাও রেখে যায় না। ওদের বাড়ীতে বলে মেয়ে পুরুষে সমান খায়! মেয়ে মানুষেও দুদ খায়। আবার গোবর ভাঙ্গিতে জানে না। আমার বৌমার কাঁকালে যখন প্রথম প্রথম গোবরের ঝুড়ি দেওয়া যেত তখন কেঁদেই অস্থির। এখন কতক ঠিক হয়েছে। তবু আমি মলে যে সংসার রাখিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। ঠাকুর যেন এর মধ্যেই ইচ্ছা যে, বউ কিছু সংসারের কাজ না করে। ব্যাটার গর্ভধারিণী চির-কাল ঐ সব কাজ করে গেলেন।

রা। ফতেপুরে যে দু তিন ঘর কায়স্থ আছে, তাদের চাল চলন বড়ই এক রকমের। ওদের মেয়েরা কোন বাহিরের কাজ

করে না। পুরুষগুলো বলে নিজেরা ভিক্ষা করে এনে খাওয়াই সেও ভাল, তবু মেয়েরা না ঘরের বাহির হয়।

নিধিরাম আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে দেখেন সম্মুখে একটী ছেলে পশ্চাতে অর্দ্ধবয়স্ক একটী পুরুষ তাঁহারই বাড়ীর দিকে আসিতেছে। পিছনের লোকটীর মাথায় কাপড় দিয়া মুখ বান্ধা একটী হাঁড়ি। বালকটী আসিয়াই নিধিরামের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া এক প্রণাম করিল। নিধিরাম যেন একটু অপ্রফুল্ল মুখেই তাহাকে "কেমন আছ?" এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিয়াই বাড়ীর ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন। সঙ্গের লোকটীকে এক ছিলিম তামাক দিয়া কলিকাটী দেখাইয়া দিলেন। বালক চলিয়া গেল। লোকটী তামাক সাজিয়া দু এক টান টানিয়া নিধিরামের সম্মুখে কলিকাটী রাখিল।

বলিয়া দিতে হইবে না যে বালকটী অনাথ ইন্দু আর সঙ্গের লোকটী পাঠকের পরিচিত রঘু।

কোন পরিচিত লোক বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর কর্ত্তা যদি তাহার আগমন ভাল না বাসেন, তবে তাড়াইবার উপায় অনেক আছে। এমন অনেকরূপ ব্যবহার আছে যে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় তিনি আর ভবিষ্যতে সে দিকে পদার্পণ না করেন। বাহির হইতে ডাকিতে ডাকিতে আগত ব্যক্তির গলা ভাঙ্গিয়া গেল, গৃহস্বামী শুনিয়াও শুনিতেছেন না; কিন্তু বাহির হইতে শুনা যায় এরূপ জোরে অপরের সহিত কথা কহিতেছেন। আগন্তুক ইহাতেই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন। নিতান্ত দেখা হইয়া পড়িল এমন ভাবে তাহাকে গৃহের অসচ্ছলতার কথা—পরিবারস্থ লোকের অসুখ জন্য

অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করা গেল যে অতি বড় নির্লজ্জ হইলেও এক বেলার বেশী দুই বেলা তিষ্টিতে পারেন না। এ সমস্ত এবং এবম্বিধ অন্যান্য অনেক কৌশল নিধিরামের অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইন্দু তাঁহার বাড়ীতে আসে ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। কিন্তু ইন্দু বালক, তাহাকে এমন প্রকারান্তরে বুঝাইলে চলিবে না। নিধিরাম রঘুকে জানিতেন। সে জ্ঞানদার সঙ্গে কথা কহে ইহাও তাহার জানা ছিল। রঘুর সমক্ষে কথা পাড়িলেই জঞ্জাল চুকিয়া যাইবে এই ভাবিয়া ইন্দু চলিয়া গেলে রাজনারায়ণ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ছেলেটী ?" অমনি আরম্ভ করিলেন—

ঐ ত কালাচাঁদ মিত্রের ছেলে।

রা। বটে, বেশ ছেলেটী ত। চেহারা আছে। বেঁচে থাকিলে মানুষ হতে পারে। যে বংশে জন্ম।

নি। তা হতে পারেন, এদিকে কিন্তু বড়ই আরম্ভ করেছেন। এই তিন মাসের মধ্যে দুবার আসা হল। এনেছেন ঐ হাঁড়িটী; ভিতরে আছে হয় ত দুখানি [illegible]সত্ব। চাটটী আমচূর কি গুটীকয়েক কাগজী লেবু—নিয়ে যাবেন হয় ত চারিটী টাকা।

রাজনারায়ণ চোক টিপিয়া রঘুকে দেখাইয়া দিলেন যেন উহার সাক্ষাতে নিধিরাম যাহা বলিতেছেন তাহা বলাটা ভাল হইতেছে না। নিধিরাম একটু চুপে চুপে অথচ রঘু শুনিতে পায় এমন ভাবে কহিলেন "ও কে, মুটে বইত নয়। ওর সাম্‌নে বলিলাম তাতে আর কি ? ওকেও চারি গণ্ডা পয়সা দিতে হবে এখন। পয়সা যেন গাছের ফল।"

রঘু সমস্তই শুনিল। তাকে শুনাইবার জন্যেই ত বলা। মনে মনে কহিতে লাগিল হা ভগবান্। কালাচাঁদ মিত্রের ছেলে তোমার দোরে এসেছে কেবল সময় খাট বলে। একদিন তুমি ওর বাড়ী থেকে কত এনেছ। পূজার সময়ে যেয়ে নৌকা করে উঠ্‌তে। আর তোমার নৌকায় চা'ল ডা'ল মিষ্টি কাপড় বইতে বইতে আমাদের কোমর ভেঙ্গে যেত। নেবার ফন্দিই বা কত? উত্তর অঞ্চলের চা'ল ভাল, মিষ্টি ভাল, ব্যাইএর কাপড় বড় ট্যাকে, গিন্নী ও কাপড় পরে অবধি আর এ দেশী কাপড় পর্ত্তে চান না এই রকম কত বাহানাই কর্ত্তে। তারা ভাল মানুষ, গলে যেত। আজি কি না সেই বাড়ীর একটা ছেলে এসেছে তোমার এখানে ভিখারীর মত। তাতে এই উক্তি?

রঘুর প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে। সে আর সেখানে তিষ্টিতে পারিল না। একটু দূরে গিয়া নির্জ্জনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—০০—

মোক্ষদার গঞ্জনা।

"স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বার মিবোপজায়তে।"

এ দিকে বাড়ীর ভিতরেও বড় ভাল যাইতেছে না। সেখানে গৃহিণী আবার নিধিরামের চৌদ্দপুরুষ। মোক্ষদা ইন্দুকে দেখিয়াই আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘামটী মুছাইয়া দিয়া কাছে বসিয়া একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভাইকে ছাড়িয়া উঠিতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। স্নান করিয়া হাঁড়ি ধরিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে দেখিয়া গিন্নি গর্জ্জাইয়া উঠিলেন। "বলি ও আমার বড় মানুষের মেয়ে! রান্না টান্না কিছু হবে, না আজ ঐ পর্য্যন্ত! এক বাপের বাড়ীর গল্পেই দিন কাট্‌বে! বাপের বাড়ীর জাঁক, বাপের বাড়ীর ড্যামাক তা ত ঘুচে গেছে। বড়

মানুষী আর ঘুচিল না।” মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গিয়া একটু তেল মাথায় ঘসিয়াই আদ্‌মনি এক কলসি কাঁকে পুকুরের দিকে ছুটিলেন, এবং স্নান করিয়া আসিয়াই রান্না ঘরে ঢুকিলেন।

আহারাদির পর বেলা প্রহরেক থাকিতে ইন্দু বাড়ী যাইবে বলিয়া বিদায় লইতে বাড়ীর ভিতরে আসিল। মোক্ষদা তখনও রান্না ঘরেই আছেন। নিধিরামের স্ত্রী উঠানে একখানি পিঁড়ি পাতিয়া পূর্ব্বমুখে রোদ পিঠ করিয়া চুল এলাইয়া বসিয়াছেন। পাড়ার এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী তাঁহার চুল বাছিয়া দিতেছেন। গৃহিণী মধ্যে মধ্যে তাম্বূলরসসিক্ত রক্তাভ বদনামৃত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া মৃত্তিকা পবিত্র করিতেছেন। ইন্দু আসিয়া তাঁহাকে একটা প্রণাম করিল এবং রান্না ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল “দিদি, বেলা গেল, আমি বাড়ী যাব।” মোক্ষদা রন্ধনশালা হইতে কহিলেন, “দাঁড়াও গিয়ে একটু বাহিরের ঘরের এ ধারের বারাণ্ডায়; আমি যাচ্চি।” বালক গিয়া সেখানে দাঁড়াইল। মোক্ষদা সমস্ত ঘরের উচ্ছিষ্টাদি মার্জ্জনা করিয়া একটা বাটীতে একটু দুধ ঢালিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন।

নিধিরাম গৃহিণী দেখিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, “কি ওতে?”

মো। একটু দুধ। ইন্দুকে দেব বলে। বেলাও গেছে। আর এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে পথে ক্ষিধে পাবে এখন।

নি, স্ত্রী। কড়াটা একবারে খালি করেছ না কিছু আছে?

মোক্ষদা ছল ছল নেত্রে কহিলেন, “না এই একবিন্দু দুধ নিয়েছি, বাটীর তলায় পড়ে আছে” বলিয়া বাটীটা দেখাইলেন।

নি, স্ত্রী। দেখে এসত নিবারণের মা কড়াতে দুধ আর

আছে কি না। কি যে বাপের বাড়ীর টান তা বল্‌তে পারি না। ওমা ঢের ঢের বউ দেখিছি, কিন্তু এমন বউএর কথাও কখনও শুনি নাই। ইচ্ছা যে আমার সংসারটা সমস্ত ধরে যদি ভাইকে দিতে পারে তবে দেয়। মানুষ বাপের বাড়ী থেকে আরও শ্বশুর বাড়ীতে আনিবে, আমার কপালে কি সব উল্‌টা? আমি শ্বাশুড়ী বলে তাই এমন বউ নিয়েও গোঁয়ালুম্‌। আর কোন লোক হত ত অমন বউকে ঝাঁটা মেরে দূর করিত।

মোক্ষদার চক্ষু দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিতেছে। বাটীটী হাতে করিয়া সেই একস্থানেই চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। যে প্রতিবেশিনী নিধিরাম গৃহিণীর কেশ-বিন্যাসে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারই পুত্রের নাম নিবারণ। তিনি উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "না কড়াতে দুধ আছে।"

মোক্ষদার মুখ দেখিয়া বোধ হয় নিবারণের মারও মনে কষ্ট হইয়া থাকিবে। নিবারণের মা সরেজমিন্‌ তদন্ত করিয়া এরূপ রিপোর্ট না দিলে আজি মোক্ষদার কপালে আরও কি ঘটিত বলা যায় না।

গিন্নি এক বিকট মুখভঙ্গী করিয়া মোক্ষদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যাও আর সঙের মতন দাঁড়াইয়া কেন? গেলাও গিয়ে দুধটা, এই ত ভাত দুধ গ্যাণ্ডে পিণ্ডে গিলে গ্যাছে। আর কিছু না রাস্তায় গিয়ে হেগে না মরে। বাড়ীতে শাকপাত খেয়ে থাকা অভ্যাস—এখানে এলেই দুধ, সর।

মোক্ষদা এখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া। মনে হইতেছে দুধের বাটীটী ঘরে ফিরাইয়া রাখিয়া যান। কিন্তু শ্বাশুড়ীর স্বভাব তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। যে ভাবেই বলুন, যখন

আদেশ হইয়াছে দুধ নিয়া যাইতে, তখন আবার তাহা কড়াতে ঢালিতে গেলে আর রক্ষা থাকিবে না ভাবিয়া মোক্ষদা বাটীটী হাতে করিয়া এক এক পা বাড়াইতে লাগিলেন। মনে কিন্তু হইতে লাগিল যে বাটী করিয়া বিষ লইয়া যাইতেছেন। একটু দূরে গিয়া গৃহিণীর চক্ষের অন্তরাল হইয়া মোক্ষদা চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। ইন্দু পাছে দেখিতে পায়। কিন্তু ইন্দুর কাছে গিয়াই আপনাহইতে তাহার কান্না আসিল, কিছুতেই অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুধটুকু তার হাতে দিয়া কেবল অঞ্চলদ্বারায় চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। "দিদি, কাঁদ কেন?" বলিয়া ইন্দু সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলে মনোবেগের আরও বৃদ্ধি হইল। কহিলেন, "ভাই, আর এখানে এস না, এলেও আমাকে দেখ্‌তে পাবে না। মা, বাবা, কাকা যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাব। এত যাতনা আর সহ্য হয় না। পরমেশ্বর তোমাকে বাঁচাইয়া রাখুন। মাগো, বাবা গো, এত সাধের মোক্ষদা তোমাদের এমন যায়গায়ও বে দিয়েছিলে!" মোক্ষদা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ইহাতেও নিস্তার নাই। নিধিরামের স্ত্রী সহসা সেইখানে আসিয়া আবার মুখ ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। "আ গেল! রকম দেখ, ভাইয়ের কাছে এসে করুণা করে কাঁদা হচ্ছে। ক্ষমতা থাকে, নে যাক্ না ভাই।"

ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল। সমস্ত পথ তাহার চক্ষের জল থামে নাই। বাড়ীতে গিয়া কাকীমাকে দিদির দুঃখের কথা কহিতে লাগিল। রঘুর মুখে জ্ঞানদা বাহিরের বৃত্তান্ত সমস্ত শুনিলেন। স্থির করিলেন, আর কখনও ইন্দুকে নসিপুরে পাঠাইবেন না।

ইহার এক মাস বাদেই জ্ঞানদা শুনিলেন, মোক্ষদা শাশুড়ীর গঞ্জনায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সমাজে কত দিনে এমন শাশুড়ী একবারে বিরল হইবে? যে গৃহে কালাচাঁদ মিত্রের কন্যা আদর পাইল না সে গৃহ শ্মশান। ফুল তাহাতে কখনই ফুটিবে না। স্বর্গীয় কুসুম আনিয়া রোপণ করিলেও মোক্ষদার ন্যায় শুকাইয়া যাইবে!



ষোড়শ অধ্যায়।

জ্ঞানদার আশা।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

আত্মীয় কুটুম্বের আশা ভরসা জ্ঞানদার একবারেই গেল। তাঁহার কোন দিনই ইচ্ছা নয় যে, তিনি পরের গলগ্রহ হন, অথবা যাঁহার তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি নাই তাঁহার নিকট কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন। স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কথনও কখনও ইহার উহার বাড়ীতে যাইতেন। কিন্তু যে দিন গোরাচাঁদের কাল হইয়াছে সেই দিন হইতে একটী সামান্য জিনিসের জন্যেও তিনি কাহারও দুয়ারে যান নাই। তাঁহার বিশ্বাস, এখন কাহারও বাড়ীতে গেলেই সে ঘৃণা করিবে। সমবেদনা থাকিলেই সেখানে সুখ দুঃখের কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। জ্ঞানদার সুখ দুঃখ জ্ঞাপন করিবার লোক এক মধু।

সে ভিন্ন আর কাহারও নিকট তিনি মুখ খুলিতেন না। তাঁহার স্বভাব বড়ই ধীর। যাহাকে দেখিব তাহাকেই ধরিয়া কষ্টের কথা জানাইব, আর সে কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবে, অথবা একটু "আহা, উহু" করিবে, ইহা তিনি একবারেই ভাল বাসিতেন না। গ্রামের লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। অনেকেই কহিতে লাগিল, "ধন্য মেয়ে! কি করে চালায় বুঝ্‌তে পারা যায় না। অথচ কখন চুনটুকুর জন্যেও কাহারও দুয়ারে আইসে না।" আবার দুএকজন এমনও বলিল, "মাগীর টাকা পোতা আছে। স্বামী মরিবার সময় কত দুঃখের কান্নাই কাঁদিল। একদিন তাকে পেটপুরে খেতে দেয় নাই। এখন নিজে ত বেশ আছে।"

ফলতঃ জ্ঞানদার সংসারের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বাড়ীর বন্দোবস্ত ক্রমেই ভাল হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞানদাকে এখন আর একদিনও উপবাস করিয়া থাকিতে হয় না। লোকের অবস্থা হীন হইয়া আসিলে প্রথম প্রথম সংসার চালাইতে বড়ই কষ্ট হয়; কিন্তু বুদ্ধি থাকিলে ক্রমে ক্রমে অবস্থার সহিত আপনার আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিয়া আনিতে পারা যায়। জ্ঞানদা এখন তাহাই করিয়া তুলিয়াছেন। অজন্মা না হইলে তাঁহার যে কয়েক বিঘা জমি তাহাতেই একরূপ খরচ চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ফতেপুরে প্রায়ই ভাল ধান হয় না। জ্ঞানদা আম কাঁঠাল গুড় বেচিয়া এবং কাঁথা করিয়া আপনার অভাব মোচন করিতেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তিনি অনেক ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন।

জ্ঞানদা একদিন রঘুকে কহিলেন, "রঘু, তুমি না একদিন

বলেছিলে ভীমনগরের একটী কাদের ছেলে বাড়ী থেকে রোজ গোবিন্দবেড়ে পড়িতে যায় ?”

র। হাঁ যায় বটে—বড় দূর। প্রায় দুক্রোশ, চারি দণ্ডের খেয়া। তাদের গ্রামের খানিকটা জমি আমি চাষ করি, তাই জানি। কেন খুড়ী ঠাকুরুণ ?

জ্ঞা। ইন্দুকে গোবিন্দবেড়ে পড়িতে দিতাম। গ্রামের রামজয় বোসের বাড়ী যে পাঠশালা তাতে কেবল বাঙ্গালা লেখা পড়া—তা ওর এক রকম হয়ে গেছে। আজিকালি ইংরাজী না পড়িলে লেখা পড়াই শেখা হয় না। তাই ভাবছি তুমি যদি ওকে সেই ভীমনগরের ছেলেটীর সঙ্গে ধরিয়ে দিতে পার বড় ভাল হয়।

র। লোকে বলে আশায়ই সংসার। আপনার খুব আশা বটে। বোধ হয় পরমেশ্বর আপনার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। নইলে এত বড় বড় আশা আপনার মনে আসিবে কেন ? একটী ছেলেকে ইংরাজী পড়াতে শুনেছি পয়সাওয়ালা লোকে ভয় খায়। আপনার যে কিছু নাই তবু আশা আছে ইন্দু দাদাকে ইংরাজী পড়াবার। ছোট কর্ত্তা বেঁচে থাকিলে বোধ হয় তাঁরও এমন ভরসা হ'ত না।

জ্ঞা। কি জান রঘু, ইন্দু মানুষ না হলে আমার সবই মিথ্যা। এত করেও যে ফতেপুরের মাটী কাম্‌ড়ে পড়ে আছি সে কেবল ওরই জন্যে। বাপের বাড়ী গেলে নিজের দুটী ভাত, একখানা কাপড় জুটিতই। কিন্তু আমার শ্বশুর কুলের নাম থাকিত না। দাদা সেবার ঐ জন্যে রাগ করে গেলেন। বুঝিলেন না যে আমার জীবনের যদি কিছু অবলম্বন থাকে তবে

সে ঐ ইন্দু। যদি কখনও আবার এ কপালে সুখ হয় তবে সে ওকে দিয়ে। ভাইই বল, আর যেই বল, ওর চেয়ে আমার সংসারে আপনার আর কেউই নাই। ওই ত আমার সন্তান। আমার শ্বশুরকুলের জলপিণ্ডের ভরসার স্থল। যে বংশে জন্ম, ও মানুষ হবেই হবে। লোকে যে যত সাহায্য করুক না করুক ভগবান অনাথনাথই ওর সহায় হবেন। মরিবার সময় অনেক বার ঐ নামটী করেছিলেন।

জ্ঞানদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রবু সান্ত্বনা করিয়া কহিল, খুড়ীঠাকরুণ কাঁদিবেন না। আমি ত বলেছি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। একটা ভাল দিন দেখে ওঁকে দিয়ে আসি স্কুলে।

জ্ঞানদা চক্ষু মুছিয়া কহিতে লাগিলেন তাই বলছিলাম যে স্কুলের মাহিনাও এখন বেশী লাগিবে না। কেতাবের দামও অধিক হবে না। এবার দুটী ধান পেয়েছি। ক্ষেতে চারিটী মটরও আছে। গুড়টুকু বেচে যে কটী টাকা হয়েছে তাও আমি রেখে দিয়েছি। দুএকখানি কাঁথা সেলাই করিতে পারিলেই আমার চলে যাবে। তুমি ওকে দিয়ে এস স্কুলে। প্রথম প্রথম দিন কতক ওর এতটা হাঁটিতে কষ্ট হবে, দুতিন মাস যেতে যেতে অভ্যাস হয়ে গেলে শেষে আর ততটা ক্লেশ বোধ থাকিবে না। কি করিব সেখানে বাসা করে থাক্‌তে মাসে বোধ হয় দুটাকা আড়াই টাকার কমে খোরাকী চলিবে না। দিন কয়েক সকালে যেয়ে তোমাকে ওকে সেই ভীম নগরের ছেলেটীর সঙ্গে দিয়ে আস্‌তে হবে, আবার বৈকালে গিয়ে, তাদের বাড়ী থেকে নিয়ে আসিবে। তার পর পথ

চিনিলেও নিজেই যেতে আস্‌তে পারিবে। রঘু "তা পারিব" বলিয়া সে দিনকার মত বিদায় হইল।

ইহার কিছুদিন পরে ইন্দু যাইয়া গোবিন্দবেড়ের মাইনর স্কুলে এক নিম্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম সারিয়াই জ্ঞানদা ইন্দুর জন্যে চারিটী গরম ভাত রাঁধিয়া দেন। প্রায়ই ভাতেভাত। কোন দিন দুটী বেগুন, কোন দিন একটী কাঁচকলা, কোনদিন গুটী কতক কাঁঠালের বিচি। তাহাই খাইয়া ইন্দু স্কুলে যায়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া জ্ঞানদার আহারীয়ের অবশিষ্টাংশ যাহা থাকে তাহাই দুটী আহার করে। রাত্রিতে একটু দুধ, একটু মিষ্টি, দুটী ফল কোন দিন যুটে, কোন দিন যুটেও না। শেষে উভয়ে সেই শান্তিপূর্ণ দরিদ্র গৃহে নিদ্রা যান। যতক্ষণ ঘুম না আইসে জ্ঞানদা শুইয়া শুইয়া ইন্দুকে কেবল সুমিষ্ট উপদেশ দেন। বিদ্যাই উন্নতির মূল, লেখা পড়া শিখিলে এই বাড়ীতেই কোটা দিতে পারিবে। যে সমস্ত লোক এখন ভুলিয়াও কথা কহে না, তাহারাই আসিয়া যাচিয়া আলাপ করিবে, ইত্যাদি কত কথাই তাহাকে বুঝান। অমুক লোক শৈশবে অতি গরীব ছিল, শেষে লেখা পড়া শিখিয়া কত আদরণীয় হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তেরও তাঁহার নিকট অভাব ছিল না। স্বভাব বিদ্যা অপেক্ষাও বড় জিনিস—স্বভাবের গুণে পর আপনার হয়, আবার স্বভাবের দোষে আপনার লোকও পর হইয়া যায়, তোমাকে লোকে ভাল বলিলে আমার মনে কত সুখ, আবার মন্দ বলিলে তেমনি দুঃখ, এরূপ কথা তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বলিতেন। বোধ হয় শত শিক্ষকের উপদেশ

অপেক্ষা জ্ঞানদার এই জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি ইন্দুর প্রতি অধিক ফলদায়ক হইত। হয়ত অনেক ভাগ্যবান ধনীসন্তানের পক্ষেও বাল্যকালে এমন স্নেহময়ী শিক্ষয়িত্রী ঘটিয়া উঠে না। ইন্দু বিদ্যালয়ের অনেক উপদেশ যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে বিস্মৃত হইতে পারেন; কিন্তু খুল্লতাত-পত্নীর এই উক্তিগুলি বোধ হয় তাঁহার চিত্তপট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না।



সপ্তদশ অধ্যায়।

রামজয় বসু ও গৌরহরি ভট্টাচার্য্য।

"মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে।"

কালাচাঁদ মিত্রের বাড়ীর উত্তরে রামজয় বসুর বাড়ী। রামজয়েরা বনিয়াদী লোক। পূর্ব্বে অবস্থা বেশ ভাল ছিল। এখন তেমন নাই। তালুকাদি যাহা ছিল বিকাইয়া গিয়াছে। এখন কেবল গ্রামে কয়েকঘর প্রজা আর খানিকটা খামার জমি এই সম্বল। রামজয় অনেক কষ্টে এখনও সাবেক ঠাটটী বজায় রাখিয়াছেন। পয়সার অভাব তাঁহার অতিশয়। উপায়ের পথও নানারূপ। কখনও লোকের বিবাদ মিটাইয়া, কোনস্থলে বা বিবাদ বাধাইয়া রামজয় পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। ন্যায় অন্যায় বিবেচনা অতি অল্পই ছিল। অন্তঃকরণ নীচ হইয়া গেলেও বনিয়াদী ঘরের ছেলে বলিয়া এখনও একবারে পূর্ণ নরকে যাইয়া পড়ে নাই; কিন্তু অবতরণ অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বাড়ীটী পুরাতন। বৈঠকখানার একধারে একখানি তক্তাপোষ, তাহার দুএকটী কোণ ভাঙ্গা। উপরে একটী মাদুর পাতা, তদুপরি একখানি গালিচা। মাঝ খানে একটী তাকিয়া। তাহার ওয়াড়টী অনেক দিন রজকালয় দর্শন করে নাই। তক্তাপোষ খানির একপার্শ্বে একটী বৈঠক তদুপরি একটী হুঁকা। অন্যদিকে একখানি ছোট জল চৌকি। সম্মুখে একটু দূরে একটী মোটা মাদুর পাতা। তার ওধারে দুএক খানি দরমা। এ ছাড়া ভগ্ন অথচ ব্যবহারোপযোগী দু চারি খানি চেয়ারও আছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের আসন সেই তক্তাপোষ খানি। [redacted]। চেয়ার কথানি স্কুলের ইন্স্পেক্টর, ট্যাক্সের আসেসর, পুলিসের দারগা বা সিভিল কোর্টের আমিন প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী যাহারা গ্রামে আইসেন তাঁহাদিগের জন্য।

সকাল বেলায় মুখ হাত ধুইয়া রামজয় চৌকির উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন এমন সময়ে গ্রামের গৌরহরি ভট্টাচার্য্য এবং তাহার পশ্চাতে একটী মুসলমান ফজরালী আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরহরি এবং রামজয়ে বড় ভাব। গৌরহরি বয়সে রামজয় অপেক্ষা দশ বার বৎসরের বড়, কিন্তু বুদ্ধিতে এবং ব্যবহারে তাহার ঠাকুর দাদা। তবে গ্রামে তেমন প্রভুত্ব নাই বলিয়া তিনি প্রায়ই রামজয়ের মন্ত্রীত্ব করেন।

রামজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে “প্রণাম ভট্টাচার্য্য

মহাশয়, আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া তক্তাপোষেরদিকে হাত ফিরাইলেন। পরে ফজরালীর দিকে চাহিয়া "বস ফজরালী" বলিয়া মাদুরটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। গৌরহরি বসিলেন। ফজরালী বসিল। কলিকায় বোধ হয় তামাক ছিল না বলিয়া রামজয় হুঁকা হইতে কলিকাটী নামাইয়া মাটীতে রাখিলেন, এবং বৈঠকের ভিতর হইতে এক ছিলিম তামাক লইয়া ফজরালিকে দিলেন। ফজরালী কলিকাটীতে আগুন তুলিয়া দেয়ালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দু একটান টানিয়া "কলিকা নেন" বলিয়া রামজয়ের সম্মুখে রাখিল। রামজয় তাহা কড়ি বান্ধা ব্রাহ্মণের হুঁকায় বসাইয়া "তামাক খান" বলিয়া গৌর হরিকে দিলেন। গৌরহরি বাহির হইতে একটী জামপাতা ছিঁড়িয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা নলপাকাইয়া হুঁকায় বসাইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

রামজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তার পর, ওটার কতদূর ?"

গৌ। আর দূর কি বলুন। এই ত ফজরালীকে সঙ্গে করে এনেছি। ও কি বিঘায় দুটাকা করে খাজনা দিতে প্রস্তুত। ওর লোক জনও ঢের আছে। দাঙ্গা ফ্যাসাদেও কোনদিন পিছ পা নয়—তা ত জানেন—

ফজরালী হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে—"

গৌরহরি আবার আরম্ভ করিলেন একেবারে একটা বিষম হাঙ্গাম করা আমার ইচ্ছা নয়। যদি সহজে মেটে তার চেয়ে আর নাই। তা ওব্যাটা থাকিতে যে হবে এমনত বোধ হয় না।

রা। রঘুর কথা বল্‌ছেন ?

গৌ। হাঁ। আমি ব্যাটাকে এত বোঝালুম, তা কিছুতেই ঘাড় পাতে না। ধমকানিতেও ভয় করে না। প্রলোভনেও বাধ্য হবার নয়।

রা। একবারে মাথায় বাড়িটী না পড়িলে বোধ হয় ওর হবে না।

গৌ। মোদ্দা আপনি ব্যাটাকে ডাকিয়ে দুট কথা বল্লেই বোধ হয় সব গোল চুকে যায়। আপনার কথা না শুনে বাঁচিবেই না। ফজরালী তাকেই ভাগ পাট্টা দিতে রাজি আছে। ও যেমন চাষ কচ্চে তেমনই করুক। ধানটা মিত্রদের বাড়ীতে না তুলে ফজরালীর বাড়ীতে দিলেই হল। ওর যে অংশ এখনও যা পাচ্চে তখনও তাই পাবে।

রা। তা ত বুঝেছি, কিন্তু আমার বলাটা একবারেই ভাল দেখায় না। গোরাচাঁদ মিত্র মরিবার সময়ে ঐ ছেলেটাকে আমার হাতে হাতে দিয়ে যায়। আমিই তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চেষ্টা কচ্চি এ কথা জানিতে পারিলে লোকে বড়ই নিন্দা করিবে। আর ত কিছু নয়, ঐ ছোট লোক গুলিকেই ভয়। গ্রামে আমি আপনি ত ঠিকই আছি। ব্যাটারা ধর্ম্মের ত বুঝে সবই, কিন্তু চেঁচাবে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে। দেখ্‌বেন আপনি আমি এতে কথা বল্লেই যেমন লোকে টের পাবে, অমনি বলিতে থাকিবে এটা বড় ধর্ম্ম খাওয়া কাজ হয়েছে। সত্য কথা শত্রুরও বলিতে হয়, ওরা ত আমার কখনও কোন অনিষ্ট করে নাই।

গৌ। ও ভাব্‌তে গেলেই তবে হয়েছে। আর ছোট লোক, ছোট লোক ছোটলোকের ভয় কি আপনার; ওদের কি মানুষ বলে ধরিতে আছে? ওরা ত সব বিদ্যাহীন পশুঃ।

শাস্ত্রকারেরা সাধে কি ওদের পশুর সমান করে গেছেন? যেমন পশুকে দেখে লজ্জা হয় না তেমনই ওদের দেখেও লজ্জা করিতে নাই। আমি ত ছোটলোক কেউ নিকটে থাকিলে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেও ভয় করি না। গরু ভেড়ার সাম্‌নে কোন কাজ করাও যা, ওদের সাম্‌নেও ঠিক তাই। আর এ কাজটায় বিবেচনা কর্ত্তে হবে আমার চেয়ে আপনার লাভ অধিক। আমার ত এক আত্মীয়ের উপকার, আপনার নগদ প্রাপ্তি। এতদূর এগিয়ে এখন কি আর ছাড়া যায়। ফজরালীর সঙ্গে পাট্টা কবুলাতী লিখিত পড়িত হয়ে গেছে।

রা। আমি কি আর ছাড়চি, না ছাড়তে বলছি? তবে কি জানেন আমার বোধ হচ্চে একটা গুরুতর গোছই বা হাঙ্গামা হয়। ও রঘো আপনার কথাত শুনেই নাই, আমার কথা শুনেও যে সহজে জমিটা ছেড়ে দেবে এমন বোধ হয় না। ঐ ব্যাটাই ত ওদের সংসারটা রাখ্‌ছে। বর্গাইত ত অনেকেরই থাকে, কিন্তু বর্গাইতে যে এত করে এ কখনও দেখি নাই। ব্যাটার দেখুন এখন লাভের আশা কিছুই নাই; তবু যেন ওদের উপর দম প্রাণ।

গো। তা যা বল্‌ছেন ঠিকই। ঐ ব্যাটার জন্যেই বিধবা ভিটায় টিকে আছে।

রা। গ্রামের অনেকেই জানে না যে রঘু কি ভাবে ওদের সাহায্য করে। শুনেছি আমটী কাঁঠালটী পর্য্যন্ত বেচে দেয়। আর বিধবারও বাহাদুরী আছে। কে ভেবেছিল যে, ও এমন ভাবে এখানে থাকতে পারিবে? আমিত ঠাউরে ছিলাম যে, হয় বেটী ভাইএর বাড়ীতে গিয়ে পড়ে থাক্‌বে, না

হয় কালাচাঁদ মিত্রের শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে কাজ কর্ম্ম করিবে, দুটী খাবে। আর যে বয়স ও বয়সে স্বভাব ঠিক রাখাও বড় কম কথা নয়। কিন্তু অতি বড় শত্রু যে সেও বলিতে পারিবে না যে, বেটি কখনও কোন পুরুষ মানুষের দিকে ফিরে চেয়েছে। তবে কি জানেন বেটীর তিনকুল শুদ্ধ। শ্যামপুরের বোসেদের নাতনি। পাঁচপুকরিয়ার ঘোষের বাড়ীর মেয়ে। ফতেপুরের মিত্রদের ঘরের বউ। ও যে ভাল হবে এর আর আশ্চর্য্য কি? ও রকম বিধবা একটী সংসারে থাকিলে সে সংসারের গৌরব। ছেলেটাকে এমন যত্ন করে যে ওর মা বাপ থাকিলে বোধ হয় অত যত্ন হইত না। ভাশুরপো বইত নয়। কিন্তু নিজের সন্তানকেও মানুষ ওর চেয়ে বেশী করে না। যে ভাবে ভিটে কাম্‌ড়ে পড়ে আছে হয়ত ঐ ছেলেকেই মানুষ করে তুল্‌বে। এঁটো পাতের ধুঁয়াই স্বর্গে উঠিবে।

গৌ। সে এখন ঢের দূরের কথা। আবার বাজে কথা এসে পড়িল। এখন কাজের কি বলুন।

বা। দেখি ব্যাটাকে একদিন ডাকিয়ে। হবে যে কিছু এমন ত বোধ হয় না। ব্যাটার যে ঘাড়, সংসারে যেন কাউকেও খাতির নাই। প্রজা হউক বা না হউক, মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে না আসে গ্রামে এমন লোকই নাই। কিন্তু ও শালা বছরে একবার আমার দোর মাড়ায় কি না সন্দেহ। তবে দেখুন আপনার বাঁড়ুয্যের কপাল, আর আমার হাত যশ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রঘুর মৃত্যু।

"পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে।"

পূর্ব্বাধ্যায়ের লিখিত কথোপকথন হইয়া গেলে তাহার পর দিনই রামজয় রঘুকে ডাকাইলেন, এবং দু এক কথার পরেই আরম্ভ করিলেন ;—

রঘু, তেরপাড়ার বাঁড়ুয্যেদের দরুণ মিত্রদের যে চারি বিঘা জমি তুমি ভাগে কচ্ছ তা ত এবার ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

র। তারা কেউ এসেছে না কি?

রা। আসবে আবার কে? একটী ছেলে আছে বইত নয়। গৌরহরি ভট্টাচার্য্য তার ভগ্নীপতি, উনিই ত সব দেখেন শুনেন। তিনিই আর একজনকে বিলি কচ্ছেন।

র। আপনি গ্রামে থাকতে এমন হবে? মিত্রদের ঐ চারি বিঘাইত জমি। ওতেই যা কিছু হয়। বাকি যা কয়েক বিঘা

সে সবই ঝরা। পাকা দূরে থা'ক, ফুল্‌তে না ফুল্‌তেই সব ধান মাটীতে।

রা। আমি কি করিব; যার জমি সে নিচ্চে। ওর ত কোন পাট্টা কবুলাতী নাই।

র। কেন থাক্‌বে না?

রা। তুই ত সবই জানিস্? যদি থাকে সেও সাদা কাগজে— আদালতে গ্রাহ্য হবে না।

র। ত্রিশ চল্লিশ বছরের দাখিলাও ত আছে?

রা। দাখিলায় কি করিবে? প্রমাণ ত চাই?

র। গ্রামের কি সব লোকই মিথ্যা কথা বল্‌বে? আপনাকে সাক্ষী মানিলে আপনিই কি বলিবেন?

রা। কে তোর মোকর্দ্দমা করিবে, বাপু?

র। আর কেউ না করেন ধর্ম্মই করিবেন। ধর্ম্মত আছেন। রাত দিন এখনও হচ্চে ত।

রঘু রামজয়ের স্বভাব উত্তমরূপ জানিত। তাহার বুঝিতে বাকি নাই যে কিছু টাকা পাইয়া তিনিই এই ষড়যন্ত্র পাকাইতেছেন। প্রথমতঃ যে দু একটী নরম কথা বলিয়াছে সে রামজয়ের মন ভিজাইবার চেষ্টায়। এখন তাহার মনের আবেগ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, শেষের কয়েকটী কথা রঘু যেন একটু ক্রোধ ব্যঞ্জকস্বরেই বলিল। রামজয়ও চটিলেন, চটিবার অবসরই খুঁজিতেছিলেন। তিনি আরম্ভ করিলেন, "ব্যাটা কি ধর্ম্মের ষাঁড় রে! ভাল কথায় বল্লুম তা ত হবে না। জমিটে তোর যেমন আছে তেমনই থাক্‌বে, কেবল ধানগুলি মিত্রদের বাড়ীতে না দিয়ে ভট্টচায্যি যাকে জমা করে দিচ্চে তার বাড়ীতে তুলিবি।"

পাপাসক্ত ব্যক্তির পরের প্রতি কোপ প্রায়ই কৃত্রিম। ূষিত অন্তঃকরণে ক্রোধের তেজ আসিবে কোথা হইতে? ামজয়ের শেষের কথা গুলি সান্ত্বনাসূচক।

রঘু সেই ভাবেই উত্তর করিল,ভট্টচার্য্যি কি আর এক জনকে দিলেই হবে?

রা। হবে না ত কি? সে বেশী খাজানা পাচ্চে দেবে না কেন? মিত্রেরা দিচ্ছিল চারি টাকা, এরা আট টাকা পর্য্যন্ত বীকার করেছে। তোর কি বাপু, এর বর্গাইত ছিলি না হয় চার হবি, যেমন ভাগ পাচ্ছিলি তেমনই পাবি। দু পয়সা চাস্, য় ত তাও মিল্‌তে পারে।

র। অমন কথা বলিবেন না। এমন কাজের ভিতর থেকে পয়সা খাওয়া সে গোরক্ত।

এবার রামজয়ের বুকে বাজিল। কারণ এইরূপে গোরক্তেই তাঁহার অংশ আছে।

"চুপ কর, হারামজাদা" বলিয়া রামজয় ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন।

র। গালি দেন কেন? আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন, আপনি গ্রামের মাথা। এই যদি আপনার স্থির হয়ে থাকে করুন, ভগবান আছেন। যে ছেলের মুখের অন্ন কাড়িতে যাচ্ছেন, তার মুখ দেখিলে পথের মানুষও ফিরে চায়। তার বাপ খুড়ায় আমার যা করেছে আমি যদি আমার গায়ের চামড়া কেটে তার পায়ের জুতা বানাইয়া দেই তাতেও বোধ হয় আমার সে উপকার শোধ হবে না।

রা। বেরো তুই। সরে যা আমার সাম্‌নে থেকে—আর রাগ বাড়াস্‌নে।

র। তা চল্লুম, কিন্তু মনে করিবেন না যে রঘুর হাড় থাক্‌তে কেউ সে জমির কাছে যেতে পারিবে।

রা। রঘুর হাড় যাতে না থাকে না হয় তাই করা যাবে। ব্রজাচাঁড়াল আজিও মরে নাই।

র। তা মরিতে ত হবেই একদিন। যদি সে ভাবে মৃত্যু আমার কপালে লেখা থাকে তাই হবে। আমি শ্মশানে গেলেও আমার মরা হাড়ে মিত্র বংশের গুণ গাইবে। আর আপনারা এই রকম কাজ করে ছেলে পুলে নিয়ে খুব সুখে থাকিবেন।

রা। মর ব্যাটা! আবার চালাকি!

রঘু দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে গৌরহরি আসিয়া দরজায় উপস্থিত। রঘু আরক্ত নয়নে তাহাকে যেন সাপের মতন ভাবিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া গৌরহরি প্রায় ঠিকই বুঝিতে পারিলেন যে কাজ মেটে নাই।

রামজয় "আসুন, প্রণাম" বলিয়া, একটু জড়িত স্বরেই তাহার অভ্যর্থনা করিলেন।

গৌরহরি বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল কি?

রা। যা ভেবেছিলেম তাই। ব্যাটা আমার সঙ্গে তেরি মেরি করিতে চায়, আর কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে ভয় দেখায়ে যায়।

গৌ। তা হলে ব্রজাচাঁড়ালকেই খবর দিতে হল।

রা। শালা অমনি গ্রামছেড়ে কিছুতেই যাবে না। ব্রজাকে ডাকিলে ত এক লাঠীর ওয়াস্তা। ব্যাটাকে একবারে কালিন্দীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে এই রকম বন্দোবস্ত করিতে হবে।

শালা আজি যে গোস্তাগীটা করেছে কি বলিব কেবল মতলব ভাল নয় বলেই বোধ হয় আমার সাহসে কুলাচ্ছিল না। তা না হলে এখানেই জুতিয়ে ওর মাথা ছিঁড়ে দিতুম।

গৌ। যাক্ আর সে কথায় কাজ কি? ব্যাটার লেখা আছে ব্রজার হাতে।

রা। বাস্তবিক কি লোকই ব্রজা। কাশীর গুণ্ডার নাম অনেক দেশে আছে কিন্তু ব্রজা বোধ হয় তাদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। এই বয়সে ও যে কত খুন হজম করেছে তা বলা যায় না। আর গুণ এই যে সব বেমালুম।

গৌরহরি যেন রামজয়ের কথায় তত মন না দিয়া এবার কি বলিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন। মুখ খুলিয়া কহিলেন—

রঘু ব্যাটা সরে গেলে আপনার অনেক কাজ হবে। কেবল যে এই জমি টুকুর ব্যাপার তা নয়। শাস্ত্রে বলেছে শত্রুকে নামেরে যন্ত্রণা দেওয়া ভাল। একবারে গলাটা না কেটে এক খানি পা খোঁড়া করে দিয়ে ছটফটানি দেখা ভাল। রঘুকে সরাতে পারিলে আপনার ও ছেলেটার সম্বন্ধে ঠিক সেই নীতির কাজ হবে এখন। বলছিলেন না সেদিন যে ঐ ছেলেটাই হয়ত মানুষ হতে পারে। রঘু ব্যাটা গেলে বেটার সব আশা ভরসা ঘুচে যাবে এখন।

রা। এটা ঠিক বলেছেন একবারে আমার মনের ভাবটা টেনে বার করেছেন। আমারও ঠিক ইচ্ছা এই যে. ছেলেটাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু না বলি, অথচ এই টা দেখি যে যেটুকু আছে, সেই টুকুই থাকুক, আর না বাড়ে। এ রকম মনের কথা আমার বোধ হয় আপনি ভিন্ন সংসারে আর কেহই বুঝিতে পারিবে না।

গৌরহরি একটু অর্দ্ধ লুক্কায়িত হাসি হাসিয়া বলিলেন, সেই ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে এ পর্য্যন্ত দেখ্‌ছিত, তাতে আবার নিত্যাশীর্ব্বাদক।

রা। তাত বটেই, তবে ঐ কথা রইল, ফজরালী জমিতে যাবে, ব্যাটা অমনি ছেড়ে দেয় ভালই, নচেৎ ব্রজা চাঁড়ালেরই শরণ নিতে হবে। সহজে যে হবে এমন ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। শালার গায়ে শুনেছি অসুরের বল। ফজরালীর গুষ্ঠি শুদ্ধ এলেও ওর কাছে ঘেঁস্‌তে পারিবে না। আর সে রকম একটা কিছু মারামারি কাটাকাটি হলেও বড় বেশীদূর গড়াবে। ওর ঠিক ওষুধই হচ্চে ব্রজা। মানুষে জানিবে না, শুনিবে না, চুপি চুপি কায হয়ে যাবে এখন।

গৌ। সে বিষয়ে আবার দ্বিধা কেন?

রা। তবু, একটা লোকের প্রাণ ত বটে।

গৌ। ঐ দেখ্‌বেন্ আবার যেন গলে যান না। এই ত ব্যাটা আপনার সঙ্গেই কতটা গোস্তাগী করে গেল। আজিকার মতন উঠি।

গৌরহরি চলিয়া গেলে রামজয় ভাবিতে লাগিলেন, বামুণ কলঙ্কের বোঝাটা দেখ্‌লুম এবার আমারই ঘাড়ে চাপালে। এতদিন ত এক রকম ছিলাম, বেটী কিছু টের পায়নি, আজি রঘু গিয়ে সব বলে দেবে এখন।—দিক্‌গে—দিক্‌গে বটে—কিন্তু বেটী হাড়ে কেটে গাল দেবে এখন। লোকে বলে "দুঃখ পেয়ে চাঁড়ালে শাপে, এড়াতে পারে না বামুণের বাপে।" ওদের বংশের কেউ কখনও আমাদের অনিষ্ট করে নাই। আর আমি ওদের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে প্রস্তুত। মনটাই কেমন—কালাচাঁদ

ত্র যখন দুপয়সা আনিত—তা যেন সহ্য হইত না। সেত আমার হায়্য উপকার ভিন্ন কখনও করে নাই। আবার মাঝে যখন । মরে ছেড়ে গেল, একটী বিধবা একটা ছেলেকে য়ে ভিটেয় পড়ে রইল, একদিন ফিরে চাই নাই। এখন কি সেই ছেলেটা কেমন একটু হব হব ভাবটা দেখাচ্ছে অমনি নটা আবার খারাপ হয়ে উঠেছে। ও কবে মানুষ হয়ে যদি আমার শত্রুতা করে—এতটা ভেবে নিলেও বোধ হয় আমার াচরণ ঠিক নয়। ভট্টচায্যি এসেই ত সব পথ দেখিয়ে দেয়। কা বোধ হয় এতদূর আমি কখনই যেতাম না। ধরিতে ালে সব পাপটাই ত আমার হবে। আমি না যোগ দিলে াধ্য কি ভট্টচার্য্যের যে ও জমির কাছে যায়? চল্লিশ বছর থলের জমি কেউ কি কেড়ে নিতে পারে? পঞ্চাশ ষাট াবার জন্যে কি গর্হিত কাযটাই কর্ত্তে যাচ্ছি। চারি বিঘা মির নূতন বন্দোবস্তে যা টাকা পাবে তাইত আমাকে দেবার থা। গ্রামের সব লোকের কাছে মুখ ছোট হবে, কেউ ত ার জান্‌তে বাকি থাকিবে না। এত যে ভাবছি আবার ট্টচার্য্য এলেই সব উল্‌টে যাবে।

এ দিকে রঘু আসিয়া সেই দিনই তৎক্ষণাৎ জ্ঞানদাকে াকিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিয়া কহিল, খুড়ী ঠাকরুণ এইবার উপায় ভাবুন।

জ্ঞানদা কহিলেন, আমাদের উপায় পরমেশ্বর। সেই অনাথ-াথ ভগবানচন্দ্র। সবই ত গেছে, বিঘা কয়েক জমি ছিল, ারা নিচ্চেন ভগবান তাদের বিচার করিবেন।

এই ঘটনার পনের দিন বাদেই ফতেপুরে রঘুর আর উদ্দেশ

রহিল না। রঘু শ্যামগঞ্জের হাট হইতে সন্ধ্যার পর একাকী নদী পার হইয়া ফতেপুরের এপারে আসিয়াছিল। একটী বটগাছের নীচে তাহার হাতের ধামাটী পাওয়া গেল। পুলিস আসিয়া তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেন বন হইতে একটা বাঘ আসিয়া অকস্মাৎ রঘুকে লইয়া গিয়াছে। ফতেপুরের নিকটে কিন্তু বাঘ থাকে এমন কোন বন নাই; আর এই আকস্মিক ব্যাঘ্র ইহার পূর্ব্বে বা পরে অন্য কোন স্থানেই কোন উপদ্রব করে নাই। ইহা হইতে আর স্পষ্ট ভাষায় আমরা এ দৃশ্য—এমন পরোপকারী, হৃদয়বান্ নিরপরাধী রঘুর জীবনের শেষ অঙ্ক—বর্ণন করিতে পারিলাম না। পাঠকের হৃদয়ে অবশ্যই তাহা অঙ্কিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ইন্দুর কৃতজ্ঞতা।

"করণং পরোপকরণং যেষাং কেষাং ন তে বন্দ্যাঃ।"

ক ইন্দু এ সব কিছুই জানে না। এই টুকু মাত্র সে য়াছে যে, তাহার রঘু দাদাকে কে মারিয়া ফেলিয়াছে। জমা কি সংসারের কোন কথাই জ্ঞানদা তাহাকে জানিতে তন না। জ্ঞানদার বিশ্বাস যে, এসব কথা তাহাকে বলিলে ার মনে অন্য ভাবনা উঠিবে, লেখাপড়ার প্রতি তেমন াগ্রতা থাকিবে না। সংসারে যে সচ্ছলতা নাই, কাকীমা চ কষ্টে চালাইতেছেন, ইহা সে বালক হইলেও অবশ্য বুঝিত; ও কাকী মাকে ঘরের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি তেন তুমি এখন ও সব কিছু ভেবো না, বাবা। কেবল দিয়া পড়। আমি যতদিন বেঁচে আছি সংসারের কোন নাই তোমাকে ভাবিতে দিব না।

ইন্দু এখন একাই স্কুলে যায়, একা আসে। ভীমনগরের সে ছেলেটী সুবিধা হওয়ায় অন্যত্র পড়িতে গিয়াছে। ফতেপুর হইতে গোবিন্দবেড়ের রাস্তা ইন্দুর যেন এখন দূর বলিয়াই বোধ হয় না। পথ কিন্তু দুক্রোশের উপর। ক্লেশ না হয় এমন নহে। তবে সংসারে যাহা এক জনের পক্ষে কষ্টকর অন্যের পক্ষে অভ্যাসবশতঃ হয়ত তাহা তেমন যন্ত্রণাদায়ক নহে। শীতকালটাই অন্যান্য কাল অপেক্ষা একটু ভাল। কিন্তু তাহাতেও দিন ছোট বলিয়া সকাল সকাল শীত থাকিতেই ইন্দু জলে পড়িয়া ডুব দেয়, ক্ষুদ্র নদীর জলে তখনও বাষ্প উঠে। বৈকালে ফিরিয়া আসিবার সময় বেলা অল্প থাকে বলিয়া স্কুলের ছুটী হইলেই ইন্দু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসে। মধ্যে মধ্যে হাঁপাইয়া পড়ে। ভয় পাছে সূর্য্য ডুবিতে ডুবিতে গ্রামের কাছে আসিয়া পঁহুছিতে না পারে। গরমের দিনে স্কুল বসে সকাল বেলা। অতি প্রত্যূষে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াও ইন্দু যাইয়া দেখে স্কুলে পড়া আরম্ভ হইয়া গি[illegible]ছে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে মাথার উপর সেই গ্রীষ্মের দিনের প্রচণ্ড রৌদ্র। বাড়ী আসিতে আসিতে বেলা দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া যায়। দু দণ্ড বসিয়া না রহিলে শরীরের ঘাম মরে না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের সময় বর্ষাকাল। পল্লীগ্রামের পথ প্রায়ই জলাকীর্ণ থাকে। রাস্তায় ইন্দুকে কতবার যে জলে নামিতে হয় তাহার ঠিকই নাই। মধ্যে মধ্যে খাল। যদি কোন খালের বাঁধ বা সেতু ভাঙ্গিয়া জল অধিক হইত, ইন্দু একখানি গামছা লইয়া আসিত এবং তাহা পরিয়া সে সমস্ত জল পার হইয়া যাইত। কর্দ্দমের ত কথাই নাই। একদি

কটু বৃষ্টি হইলেই তিন চারিদিন পথে কাদা জমিয়া থাকিত, াঠের রাস্তায় নর্দ্দামা বা পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত নাই। ফতেপুর ইতে গোবিন্দবেড়ের রাস্তা প্রায়ই মাঠের উপর দিয়া। প্রথমেই এক ক্ষুদ্র মাঠ, তার পর সেই ছোট নদী যাহা ফতে- রের নীচে দিয়া গিয়াছে—পার হইলেই এক প্রকাণ্ড প্রান্তর; সইটা ছাড়াইলে তবে পল্লী, আর খানিকটা হাঁটিলে গোবিন্দ- বড় স্কুল। দুতিনমাস এই পথের জলকাদায় হাঁটিয়া ইন্দুর ায়ে ঘা হইয়া যাইত। শয়নের পূর্ব্বে বালক প্রায়ই বলিত াকীমা বড় পা জ্বালা কচ্ছে। আঙ্গুলগুল একবারে কাদায় খয়ে গেছে। জ্ঞানদা ঘা দেখিয়া তাহাতে হয় একটু তাজা ন, না হয় প্রদীপের গরমতেল লাগাইয়া দিতেন। ইন্দুর পক্ষে হাই যেন ধন্বন্তরী প্রদত্ত ঔষধ হইত। তার বিশ্বাস, কাকীমা দিবেন, তাতে সারিবেই সারিবে।

শ্রাবণ মাস। সূর্য্য অস্তে যাইবার এখনও বেশ বিলম্ব াছে। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় দিনেই যেন সন্ধ্যা ইয়া উঠিয়াছে। ইন্দুর স্কুলের ছুটী হইবার পর মেঘ ্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। আকাশের যে যে কোণ একটু কটু পরিষ্কার ছিল, একে একে মেঘে পূরিয়া কাল হইয়া াসিল। মেঘ ক্রমেই গাঢ় হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঠিয়াছে। বৃষ্টির পূর্ব্বচিহ্ন দুএকটী পক্ষী লক্ষ্যহীনভাবে উড়িয়া বড়াইতেছে। ইন্দু এই নির্দ্দয় গগনের নীচে দিয়া বাড়ী মুখে টিতেছে। তাহার পরিধান একখানি কস্তাপেড়ে বিলাতী ্তি, গায়ে একখানি আদ ময়লা বিলাতী চাদর, বাম বগলে য়েকখানি পুস্তক ও কাগজ। জামা, জুতা, ছাতা কিছুই নাই।

ইন্দু গোবিন্দবেড় গ্রাম ছাড়াইয়া সেই বড়মাঠটীতে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে একটাও লোক দৃষ্ট হইতেছে না। কেবল দুএকজন রাখাল গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গ্রামাভিমুখে ছুটিতেছে। অন্যান্য গরুগুলি সম্মুখে রাখিয়া যার পালে যেটা দুষ্ট সেইটার লেজ মলিতে মলিতে কখনও দৌড়াইতে দৌড়াইতে, কখনও বা লাফাইতে লাফাইতে, রাখালগণ যাইতেছে। কেহ কেহ অপূর্ব্ব স্বরে গান ধরিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুএকটী গরু রাস্তা ছাড়িয়া এদিকে ওদিকে গেলেই রাখাল দুষ্ট গরুটার লেজ ছাড়িয়া দিয়া পথভ্রষ্ট গরুটার দিকে দৌড়াইতেছে এবং ধরিতে পারিলেই দু এক ঘা লাঠী মারিয়া মধুর সম্ভাষণে তাহাকে আনিয়া পালে মিশাইতেছে।

ইন্দু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়াছে। এক একবার আকাশের দিকে তাকাইতেছে, আবার ছুটিতেছে। মাঠ ফুরাইল, ইন্দু আসিয়া নদীর নিকটে পঁহুছিল। সম্মুখেই খেয়া ঘাট। চৈত্র বৈশাখে এ নদী লোকে হাঁটিয়া পার হয়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহারই মূর্ত্তি ভয়ানক হইয়া উঠে। ইন্দু দেখিল, খেয়ার নৌকা এ পারেই আছে, কিন্তু তাহাতে তিনটী লোক উঠিয়াছে। দুতিন রসি দূরে থাকিতেই চেঁচাইতে লাগিল "ওগো, আমাকে নিয়ে যেও।" নৌকার লোক বোধ হয় শুনিতে পাইল না। শুনিয়া থাকিলেও তাহারা নৌকা রাখিল না, ছাড়িয়া দিল। বালক প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল, যখন ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল তখন নৌকা প্রায় সিকি নদী আসিয়া পড়িয়াছে। ইন্দু পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল। নৌকায় দুটী যুবক ও একটী বৃদ্ধ ছিল যুবকেরা নৌকা বাহিতেছিল। বৃদ্ধটী বালকের করুণাব্যঞ্জক স্বর

শুনিয়া কহিতে লাগিল, "ওগো নৌকাটা ফিরাও না, ছেলেটীকে নিয়ে এস। ও সেই ফতেপুরের মিত্রদের ছেলেটী। রোজ বাড়ী থেকে গোবিন্দবেড়ে পড়িতে যায়, আজি যেদিন — হয় ত আর নৌকা এ পারে আসিবেই না—ছেলেটী পড়ে থাকবে। ওর বাড়ীর লোকে কত ভাব্‌বে এখন।" পশ্চাতে যে লোকটী হাল ধরিয়াছিল সে বলিল, "রেখে দাও তোমার ছেলে মানুষটা। পারের প্রায় অর্দ্ধেক এসে পড়িলাম, এখন আবার ফিরে যাব?" সম্মুখে যে লোকটী দাঁড় টানিতেছিল তাহারও এই মত হইল। সুতরাং বৃদ্ধের কথা টিকিল না। ইন্দু এ পারেই পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধ তবু একবার বলিল, "আহা! ছেলেটী কোথায় যাবে এখন!"

হায় রে স্বার্থপর মানুষ! ছেলেটীকে লইয়া যাইতে কতই বিলম্ব হইত। নিজের হয় ত সে সময় টুকুতে কিছুই কাজ হইবে না। অথচ বালকটীকে ফেলিয়া গেলে। সংসারে অনেক লোকই এই শ্রেণীর। রেলওয়ে গাড়ীতে, পারঘাটা প্রভৃতি স্থানে এইরূপ স্বার্থপরতা বড়ই পরিস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হয়। গাড়ীতে স্থান রহিয়াছে, অথবা যাহা আছে তাহাতে আগন্তুক অনায়াসে যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে উঠিতে দেওয়া হইবে না—নিজে পা ছড়াইয়া বসিব—হয়ত আমার অপেক্ষা তাহার যাইবার প্রয়োজন অনেক অধিক। কিন্তু তাহা কয়জনে ভাবিয়া থাকেন?

ইন্দু খানিকটা ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিল সেদিন আর নৌকা এ পারে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল সাঁতরাইয়া যাই। কিন্তু জলের বেগ দেখিয়া তাহার সাহসে কুলাইল না। ইন্দু সন্তরণে তেমন পটু নহে।

সুতরাং পশ্চাতে ফেরা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অগত্যা ইন্দু তাহাই চলিল। দু এক পা যায়, আবার খেয়াঘাটের দিকে ফিরিয়া চায়, যদি একটী লোকও এসে পড়ে। কিন্তু মানুষ কেন, অন্য প্রাণী পর্য্যন্তও দৃষ্ট হইতেছে না। এ দিকে মেঘ সমস্ত গগন ছাইয়া পড়িল, শীতল বাতাস উঠিল, ইন্দু বুঝিল এখনই জল আসিবে। আন্দাজ এক পোয়া রাস্তা না গেলে আর মানুষের বাড়ী মিলিবে না। ইন্দু দৌড়াইল। খানিকটা যাইতেই বৃষ্টি নামিল। মাঠের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গাছ দেখিয়া বালক তাহার নীচে যাইয়া উঠিল। চাদর খানি ভাঁজ করিয়া তদ্দারা বই কখানি জড়াইয়া লইল, এবং খালি গায়ে খালি মাথায় বৃক্ষের গুড়িটীর নিকটে দাঁড়াইল। প্রথম দু চারি ফোঁটা বৃষ্টি তাহার গায়ে লাগিল না। কিন্তু যখন বৃষ্টি অধিক হইল, গাছের পাতা সমস্ত ভিজিয়া গেল, তখন বরং মোটা মোটা ফোঁটা বালকের মস্তকে এবং গায়ে পড়িতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি কেবল সেই চাদর মোড়া বই কখানির প্রতি—পাছে সেগুলি ভিজে। নিজের শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু মানুষ কতক্ষণ মস্তক পাতিয়া অবিরাম মুষলধারার শ্রাবণের ধারা সহ্য করিতে পারে? ক্রমে বালকের শীত ধরিল। এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সাঁ সাঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিজলি খেলিয়া কড় কড় শব্দে মেঘ গর্জ্জন হইতেছে। ইন্দুর শিরায় শিরায় যেন আতঙ্কের বিদ্যুৎ খেলিতেছে। খানিকটা গেলেই একটা মুসলমানের বাড়ী পাওয়া যায়। বই শুদ্ধ চাদরখানি কোঁচার কাপড়ের ভিতর রাখিয়া একহাতে সেই কাপড়টী ধরিয়া ইন্দু

মানের বাড়ীর দিকেই দৌড়াইল এবং ভিজিতে ভিজিতে গিয়া বাহিরে গোয়াল ঘরের দরজায় আশ্রয় লইল। সেখানে বই কখানি রাখিয়া বালক কোঁচার কাপড়টী খুলিল এবং তদ্দ্বারা মস্তক এবং গাত্র মার্জ্জন করিয়া ফেলিল। চাদর খানি খুলিয়া গায়ে দিল এবং কতক্ষণে বৃষ্টি ধরিবে, অন্য এক বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ইন্দু দেখিতে পাইল নিকটে একটী কুক্কুটী অনেকগুলি শাবক লইয়া নিজের পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছে। যেটী বাহিরে পড়িতেছে, সেইটীকেই ভিতরে টানিতেছে। বালক দেখিয়াই মনে মনে কহিল, হায়! সন্তানের উপর মার কি মায়া! মুরগীটা পারিতেছে না অথচ সকল ছানাগুলিকেই ঢেকে রেখে বৃষ্টি থেকে বাঁচাইবার চেষ্টা। আমার কাকীমা কিন্তু মার চেয়েও বেশী। বোধ হয় মা থাকিলেও আমার এমন যত্ন হইত না। কিছু নাই, তবু সেই ভাঙ্গা ঘরেই কাকীমা আমাকে কতকষ্টে এই রকম করে ঢেকে রাখেন। কাকীমা, তোমার ঋণ আমি জন্মজন্মান্তরেও শুধিতে পারিব না। তুমি না থাকিলে এত দিন আমি কোথায় যেতাম। আজি এতক্ষণ তুমি, আমার জন্যে কতই ভাব্‌ছ—কতই কাঁদছ। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু দেখিল মাঠের দিক হইতে তাল-পাতার মাথাল মাথায় দিয়া একটী লোক একটা গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গ্রামাভিমুখে আসিতেছে। বলিতেছে, “শালার গরু, তখন রাখালের সঙ্গে গেলে আর আমার এ ভোগটা হয় না, এতটা বৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়া যায় না।” ইন্দুর অমনি মনে হইল, “হায় রে! সংসারে একটা গরুর খোঁজ নিতেও মানুষ

আছে, কিন্তু আমার খোঁজ নিতে কেহই নাই। মুসল দাদা, আজি যদি তুমি থাক্‌তে, তবে নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজতে বেরুতে। কত ভালই বাস্‌তে আমায়? তুমি বেঁচে থাকলে আমার আর কাকীমার উপকার হবে বলেই কি লোকে তোমায় মেরে ফেল্লে?" বালক কাঁদিয়া ফেলিল।

জ্ঞানদে! এই তোমার পুরস্কার! ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের এমন অকপট কৃতজ্ঞতা জগতে কয়জনে অর্জ্জন করিতে পারেন। রঘো! এই তোমার মৃত্যুর পর মার্ব্বেলনির্ম্মিত স্মৃতি চিহ্ন অথবা প্রস্তর-ক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তি ইহা অপেক্ষা শতগুণে নিকৃষ্টতর। সভ্যতার খাতিরে শত শত ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া সভামধ্যে কণ্ঠস্থ বক্তৃতা উদ্গীরণে মৃত ব্যক্তির যে স্তুতিগান করেন, এই সরল বালকের স্বতঃপ্রণোদিত একটী কথাও তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণও যাহার জীবনে একটীও অন্যায় কার্য্য দেখাইতে না পারেন, যদি একজন লোকও তৎকৃত উপকার স্মরণে চক্ষের জল ফেলে, তবে তদপেক্ষা শ্লাঘ্যজীবন আর কি হইতে পারে? কৈবর্ত্তকুলালঙ্কার রঘুর জীবন এই শ্রেণীর ছিল। অর্থের প্রলোভনে তাহার মন গলে নাই। দুর্ব্বৃত্তের ধমকে তাহার সাহস টলে নাই; রঘু এক দিনও কর্ত্তব্য ভুলে নাই। উপকারীর উপকার কখনও ভুলিব না প্রতিজ্ঞা করাতেই সে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। পরম পিতার পররাজ্যে এই হলধারী কৈবর্ত্ত হয় ত কত বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবে।

বিংশ অধ্যায়।

—oo—

অপরিচিত ব্রাহ্মণ।

"অহিতো দেহজো ব্যাধি হিতমারণ্যমৌষধম্।"

সে দিন আর বৃষ্টি একবারে থামিল না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু দুএক ফোঁটা পড়িতেই লাগিল। ইন্দু সেই মুসলমানের বাড়ীর একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, নিকটে কোন হিন্দুর বাড়ী আছে কি না। সে কহিল, এক ব্রাহ্মণের বাড়ী আছে। ইন্দু সেখানে যাইবে স্থির করিল। মুসলমান বালকটী পথ দেখাইতে তাহার সঙ্গে চলিল। বৃষ্টির জল হইতে মাথাটী বাঁচাইবার জন্যে ইন্দু একটী মানপাতা ছিঁড়িয়া লইল। ব্রাহ্মণ অতিথি বালককে বিশেষ যত্ন করিলেন। কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র বলিতেই তিনি চিনিতে পারিলেন। পল্লীগ্রামে এরূপ জানা শুনা থাকিয়াই থাকে। যে

গ্রামে এই ব্রাহ্মণের বাড়ী তাহা ফতেপুর হইতে ক্রোশা-ধিক হইবে। কিন্তু কায়স্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই কালাচাঁদ মিত্রকে জানিতেন। নগর কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এরূপ জানা শুনা অসম্ভব। সেখানে লোকসংখ্যা যেমন অধিক, পরস্পরে সম্বন্ধও তেমনি অল্প। কিন্তু ইহাতে যাঁহারা বলেন যে, সহরের লোকের সহানুভূতি বড় কম, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, পল্লীবাসীর প্রতিবেশীর নিকট উপকার পাইবার আশা যেমন অধিক, তাহার হিংসানলে দগ্ধ হইবার আশঙ্কাও তেমনি প্রবল। সহরে এদিক ও নাই, ও দিকও নাই।

গৃহস্বামী ইন্দুকে আহারাদি দিয়া নিজে তাহারই কাছে বাহিরে শয়ন করিলেন। এবং তাহাকে তাহার বাড়ীর অবস্থা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক যথাসাধ্য বর্ণনা করিল। ব্রাহ্মণের শুনিয়া মনে বিশেষ কষ্ট হইল। ইন্দু শেষে কহিতে লাগিল, আমি এখানে আছি কাকীমা যে কি কচ্চেন বলিতে পারি না। সন্ধ্যার সময় আজ যে ঝড়বৃষ্টি গিয়াছে। এতদিন স্কুলে যাচ্ছি, এক দিনও এমন হয় নাই। রাত্রি হলেও বাড়ী পৌঁছিয়াছি; কিন্তু আজ আর পারিলাম না।

যতক্ষণ ঘুম না আসিল ইন্দু কেবল তার কাকীমার কথাই বলিতে এবং ভাবিতে লাগিল। ক্রমে তাহার ঘুম ধরিল। এত যে অস্থির মন আজি, তবু বালক গৃহস্বামীর পূর্ব্বেই সুপ্তির শান্তিময় ক্রোড় লাভ করিল। ব্রাহ্মণ হয় ত তাহারই কথা ভাবিতেছেন। তবু তাঁহার তত শীঘ্র নিদ্রা আসিল না। বৃদ্ধের ভাবনা আর বালকের ভাবনায় অনেক প্রভেদ। সাধে কি মানুষ বালক হইতে চায়? ইন্দু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও এক

একবার "কাকীমা, কাকীমা" বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিদ্রাবস্থায়ও সে কাকীমাকে ভুলিতে পারে নাই। অন্তরের টান থাকিলে এমনই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের শুনিয়া প্রাণে এতই লাগিল যে, এক একবার মনে হইতে লাগিল এই রাত্রেই ওকে ওর কাকীমার কাছে দিয়া আসি। তিনি ত আর গ্রামের গৌরহরি ভট্টাচার্য্য নহেন।

সে রাত্রি জ্ঞানদার কি ভাবে গিয়াছে, পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। ঝড় বৃষ্টি আসিতেই জ্ঞানদার মনে প্রবল চিন্তার ঝড় বহিতে লাগিল। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুর বাড়ী আসিবার আশারও একরূপ অবসান হইল। ক্রমে অন্ধকার যত বাড়িতে লাগিল, জ্ঞানদার চিত্তও ততই অন্ধকার হইয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রি হইলে জ্ঞানদা আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। যে পথে ইন্দু আসে সেই পথ ধরিয়া যেন অজ্ঞান অবস্থাতেই জ্ঞানদা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃষ্টির জল পড়িয়া তাঁহার বস্ত্র এবং সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গেল। জ্ঞানদার জ্ঞান নাই। অনেক দূর যাইয়া জ্ঞানদা ফিরিলেন। মনে হইল, ইন্দু এতক্ষণ অন্য কোন পথ দিয়া বাড়ী আসিয়া থাকিবে। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গৃহ শূন্য দেখিলেন। কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় জ্ঞানদা অনেকক্ষণ দরজায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আবার বাহিরের দিকে ছুটিলেন। সেই আর্দ্র বস্ত্রই তাঁহার পরিধানে রহিয়াছে। মস্তকে এবং সর্ব্বাঙ্গে জল ঝরিতেছে। ইচ্ছা করিলে তিনি কাপড় ছাড়িতে অথবা গাত্র মার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহার মনে নাই। জ্ঞানদার হৃদয় একই ইন্দুর চিন্তা-

তেই পরিপূর্ণ। অন্য কথার স্থান কোথায়? ইন্দুর বিপদাশঙ্কাই তাহার মনে আসিতে লাগিল। জ্ঞানদা এক একবার পাগলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, বাবা অনাথনাথ, তুমিই জান বাবা, আমার ইন্দুর সংসারে কেহই নাই। তোমার নাম নিয়েই পড়ে আছি। ইন্দু তোমারই, তুমি রাখিলে অবশ্যই থাকিবে। আর আমার কিছু নাই বাবা। ঐ এক সুতা নিয়ে সংসারে আছি, আমি যেন মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি, বাবা। এক একবার ইন্দুকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আজি যদি আমার কিছু থাকে তাহলে কি এই বর্ষার দিনে আমি তোমায় জল সাঁতরে দুক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়ে স্কুলে পাঠাই বাবা? এমন দিনে কার ছেলে হেঁটে বেরোয় বাবা? এই ঝড় বৃষ্টিতে আজি কোথায় দাঁড়িয়েছ, বাবা! ইহার পর জ্ঞানদার অন্তঃকরণে যে চিন্তার উদয় হইল, তাহা লিখিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইন্দু যদি মাঠের মাঝ খানে কোন গাছের তলায় দাঁড়াইয়া থাকে, গাছ তলায় শুনেছি বজ্রপাতের ভয় বেশী—তাহলে উঃ—ভগবন্—জ্ঞানদার মন আর অগ্রসর হইতে পারিল না—মস্তক ঘুরিয়া গেল—আমাদের হস্তস্থিত লেখনীও বোধ হয় বজ্রময়ী হইলেও আর অগ্রসর হইতে পারিত না।

একটু বাদেই জ্ঞানদা যেন একটু আশ্বস্ত চিত্তে কহিলেন, "যেথানেই থাক বাবা ভগবান অনাথনাথই তোমায় দেখ্বেন।" এই বার যেন জ্ঞানদার একটু জ্ঞান হইল। তিনি বুঝিলেন, গোবিন্দবেড়ে যাইবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। জ্ঞানদা কাহাকে বলিবেন ইন্দুর খোঁজ নিতে? রঘু ত আর নাই। রঘুর ছেলেরা কেহই ফতেপুরের

পথ চেনে না। জ্ঞানদা দুতিন জন স্বর্ণকার ও কুম্ভকারকে অনুরোধ করিলেন একবার দেখিয়া আসিতে। তাহারা প্রত্যেকেই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, এ রাত্রিতে ইন্দু কখনই রাস্তায় নাই—কোন না কোন বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার খোঁজ কেমনে করিয়া সম্ভবে? কাল সকালেই বাড়ী আসিবে ইত্যাদি। জ্ঞানদা ইহা বুঝিলেন না। মনের ব্যাকুলতায় বুদ্ধিমতী রমণী ভাবিলেন, রাত্রিতে উহারা ঘরের বাহির হইবে না বলিয়া আমাকে এরূপ বুঝাইতেছে। তাহাদিগের উপর জ্ঞানদার জোর নাই। তিনি দেখিলেন, প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে। জ্ঞানদা কেবল ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। রাত্রিটা তাঁহার কাছে যুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়াই ইন্দু বাড়ী মুখে ছুটিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিয়া দিলেন, যে দিন ঝড় বৃষ্টি দেখ, এসে আমার এখানে থাকিবে। ইন্দু পথেই কাকীমার দেখা পাইল। জ্ঞানদা দৌড়াইয়া আসিয়া পবিত্র স্নেহমাখা স্বরে, এস আমার অন্ধের নড়ি, বলিয়া ইন্দুকে একেবারে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। ক্ষণকাল উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। শেষে জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল কোথায় ছিলে বাবা? আমি যে ভাবিতে ভাবিতে-ছিলাম না। ইন্দু সমস্ত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিতে লাগিল। জ্ঞানদার চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল, কহিলেন, বাবা অনাথনাথ এই রকম করেই তোমাকে রক্ষা করিবেন। সে দিন আর জ্ঞানদা ইন্দুকে স্কুলে যাইতে দিলেন না।

একবিংশ অধ্যায়।

—— oo ——

ডাক্তার কামাখ্যা চরণ বসু।

"অভিগমা চ তত্তুষ্টা দত্তমাক্রভিষ্টুতম্

ইন্দুর যা কিছু আব্দার কাকীমার কাছে। জ্ঞানদাই তার মা। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে সেই মামার বাড়ীতে ভাঙ্গা সন্দেশ পাইবার দিন হইতেই তাহার আর কোন আব্দার ছিল না। কেবল আব্দার ছিল না তাহাই নহে; সে কাকীমার কষ্ট সম্যক বুঝিতে পারিত এবং সাধ্যমত তাঁহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিত। ছাতা নাই, জ্ঞানদা বলিতেছেন, হউক বাবা কষ্ট, অল্পদামের একটা ছাতা কিনিয়া লও। ইন্দু বুঝাইত না কাকী মা, একটা ছাতার দামে আমার দুমাসের স্কুলের মাইনে হবে এখন। চাদর মাথায় দিলে আর রৌদ্র টের পাইব না। কাপড় চাদরও যাহা ব্যবহার করিত তাহা যত দিন চলে ইন্দু ছাড়িত না। অন্যে যে অবস্থায় ছেঁড়া বলিয়া ফেলিয়া দেয়

ইন্দুর তাহাতে ঘৃণা হইত না। এত সাবধানে কাপড় ব্যবহার করিত যে, তাহার কাছে তাহা প্রায়ই ছিঁড়িত না। একবারে সমস্ত কাপড় জীর্ণ হইয়া পচিয়া যাইবে অথচ আস্ত থাকিবে। এমন না হইলে আর এত দুঃখের অবস্থায়ও চলিত কি? জ্ঞানদা হয়ত সময়ে সময়ে বলিতেন ও কাপড়ের আর দাস্ত নাই, বাবা। একবারে গিয়াছে। ইন্দু জিদ্ করিত এখনও এক ধোব পরা চলিবে। সেই কাপড় আবার ক্ষারে ধোত হইত। ঘরে পয়সা থাকিলে জ্ঞানদা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দু একটা পয়সা ইন্দু ইস্কুলে যাইবার সময় তাহার হাতে দিয়া কহিয়া দিতেন বাবা, জলখাবার ছুটী হলে যা কিছু কিনে খেও। বালক তাহা আদরে গ্রহণ করিয়া আবার ফিরাইয়া আনিয়া দিত। জ্ঞানদা জিজ্ঞাসিতেন, কি বাবা, কিছু খাও নাই? না কাকী মা, ক্ষুধা পায়নি বলিয়া ইন্দু উত্তর করিত। জ্ঞানদা মাছ রাঁধিয়া ইন্দুর পাতে দিলেই বালক বলিত কাকী মা, পয়সা দিয়া আবার মাচ কিনেছ কেন? তোমারও রাঁধ্‌তে কষ্ট হয়, আর আমারও মাচ খেতে তেমন প্রবৃত্তি নাই, নিরামিষ তরকারী দিয়ে ভাত খাই, খুব মিষ্টি। এত যে কষ্ট তবু জ্ঞানদা সময়ে সময়ে বলিতেন "বাবা যা খেতে ইচ্ছা হয় আমাকে বলো। আর কি কেউ আছে সংসারে তোমায় জিজ্ঞাসা করিবার? ইন্দু কাকীমার মনের সন্তোষ সাধনের নিমিত্তই মধ্যে মধ্যে দুএকটী জিনিসের নাম করিত যাহা অনায়াসলভ্য অথচ অর্থসাপেক্ষ নহে। হায়! পৃথিবীতে যদি অনেক যুবকেরও এই বালকের বুদ্ধি থাকিত, যেমন অবস্থা সেইরূপ আব্দার করিত, তাহা হইলে অনেকের সংসার মাটী

হইত না। কাঙ্গালের ছেলের ঘোড়া রোগ হয়েই ত মানুষ মারা যায়।

ভাদ্র মাস, লোকে আউসধান কাটিয়াছে। ইন্দু জ্ঞানদার কাছে মুখ ফুটিয়া বলিয়াছে কাকীমা, দুটী নূতন ধানের চিড়া খাব। জ্ঞানদা শুনিবামাত্র বাড়ীর পুরাতন ধান দিয়া নাপিত-দের বাড়ী হইতে দুটী নূতন ধান আনাইয়াছেন। আপনাদের ক্ষেতে এবার আউস ধান নাই। বাঁড়ুয্যের জমিতেই আউস ধান হইত। তাহা ত গিয়াছে। বালক ইন্দু ইহা জানিলে বোধ হয় এ আব্দারও করিত না। সে জানে প্রতি বৎসরেই ধান পাওয়া যায়। এবারও অবশ্যই কিছু পাওয়া গিয়াছে।

জ্ঞানদা সেই দুটী চিড়া কুটিতেছেন। রঘুর স্ত্রী ঢেঁকিতে পার দিতেছে। জ্ঞানদা ধানগুলি ভাজিয়া নোটে দিতেছেন। নিকটে রঘুর আট বৎসর বয়স্কা একটী মেয়ে। তার নাম সুধী। সে তাহার মাতার সঙ্গে আসিয়াছে। একখোলা ধান বাকি আছে এমন সময়ে জ্ঞানদা শুনিলেন বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া কে চেঁচাইতেছে "বাড়ীতে কে আছেন গো; এইটে কি মিত্র-দের বাড়ী?" জ্ঞানদা সুধীকে বলিলেন সুধি বাহিরে যেয়ে দেখ্‌তো কে। সুধী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল একটী বাবু আর তার সঙ্গে একটী লোক বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি চিড়া খোলা সারিয়াই—রঘুর স্ত্রীকে সেখানে রাখিয়া—বাহিরের দিকে আসিলেন। চাহিয়া দেখেন সেই সৌম্যমূর্ত্তি ডাক্তার বাবু। জ্ঞানদা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঘরের ভিতরে গেলেন। সুধীকে কহিলেন তুই দরজায় দাঁড়া। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসিলেন—

হ্যাগা এইটে কি সেই মিত্রদের বাড়ী ?

জ্ঞানদা ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া দিতে লাগিলেন। সুধী উত্তর করিল, আজ্ঞে হাঁ।

ডা। এঁদের এখন আছেন কে কে ?

সু। বড় বাবুর সেই ছেলেটী, আর ছোট ঠাকরুণ।

ডা। সেই ছেলেটী—তার নাম ইন্দু না, সে কোথায় ?

সু। গোবিন্দবেড়ে পড়িতে গেছেন।

ডা। কতদিন সেখানে আছে ?

সু। রোজ রোজ বাড়ী থেকে যান।

ডা। রোজ এতটা পথ হেঁটে ?

সু। আজ্ঞে হাঁ! সেখানে বাসা খরচ করে থাক্‌তে গেলে চলে না।

ডা। এঁদের চল্‌ছে কিসে ?

সু। চল্‌ছে অতি কষ্টে।

ডা। জমি জমা একটু ছিল না ?

সু। যাও ছিল তা গ্রামের লোকে বাহির করে নিয়েছে।

ডা। হা ধর্ম্ম! এমন নিরাশ্রয়ের বস্তু কেড়ে নেবে না ত নেবে কার ?

ডাক্তার বাবু আরও দুই চারিবার উঠানে পাদচারণ করিতে করিতে ভাবিলেন, এই রকম লোককে সাহায্য করাতেই ফল। পকেটে হাত দিলেন। পরে বলিলেন ওঁকে বল আমি কিছু দিয়ে যাচ্ছি ওঁদের সাহায্যের জন্য ; এ নিতে মনে যেন কোন সঙ্কোচ না করেন। আর আমি ইন্দুকে আমার বাসায় নিয়ে এসে যাতে তাহার পড়ার সুবন্দোবস্ত হয় তা করিব।

জ্ঞানদা ভাবিতে লাগিলেন এমন লোকও জগতে আছে? মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া সুধীকে কহিলেন, যা সুধী, যা দেন নিয়ে আয়। জ্ঞানদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। সুধী টাকা আনিয়া জ্ঞানদার হাতে দিল, গণিয়া দেখেন দশটী টাকা। জ্ঞানদার কাছে ইহা সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় বোধ হইল। মনে মনে কেবল ডাক্তার বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা দানের মহত্তর প্রতিদান এ জগতে আর নাই।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে জ্ঞানদা বাড়ীর ভিতরে আসিলেন এবং রঘুর স্ত্রীকে সমস্ত কহিয়া দুটী টাকা হাতে লইয়া কহিলেন "সুধীর মা এই দুটী টাকা নাও।"

রঘুর স্ত্রী। সে কি ছোট ঠাকরুণ—আপনার যে কষ্ট, আমার তবু যা হ'ক ছেলেরা এখন সকলেই কিছু কিছু আনছে, এক রকম চলে যাচ্ছে।

জ্ঞা। "তা হউক, রঘুর শ্রাদ্ধের সময়ে আমি একটী পয়সাও দিতে পারি নাই। আমার যদি কিছু থাকে"—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া জ্ঞানদা আবার কহিলেন "নাও তুমি!"

রঘুর স্ত্রী আর একবার বলিয়াও জ্ঞানদার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া টাকা দুটী গ্রহণ করিল।

এই মহত্ত্ব। নিজের কিছু নাই, অথচ দান করিবার প্রবৃত্তিটী আছে। ভিক্ষার ধনও অপরকে বণ্টন করিয়া দিবার ইচ্ছা আছে!

জ্ঞানদে! রঘু যেমন একদিন বলিয়াছিল, তেমনই আমরাও বলি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবেই হইবে। এত বড়, এমন পবিত্র মন যাঁর জগদীশ্বর অবশ্যই তাঁর সহায় হইবেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ইন্দুর আশ্রয়প্রাপ্তি।

"সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বাণা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্।"

ডাক্তার বাবুর নাম কামাখ্যাচরণ বসু। বাড়ী হুগলী জেলায়। বাল্যকাল হইতেই ইহার স্বভাব অতি উদার ছিল। কামাখ্যা বাবু যখন ছেলেবেলায় স্কুলে পড়িতেন, তখন নিজের জলখাবারের এক আনা পয়সা দিন দিন বাঁচাইয়া মাসের শেষে তিন চারিটী গরীব ছেলের মাহিনা দিতেন। অনেক দিন পরে একজন চাকর ইহা টের পাইয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়া দেয়। তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার অবস্থাও মন্দ ছিলনা। পুত্রের মন বুঝিয়া কহিয়া দেন, "তুমি যেমন জল খেতে, খেও। যে কটী ছেলের মাহিনা দাও, তাহা আমি আলাদা দিব।"

যৌবনেও কামাখ্যা বাবুর অন্তঃকরণে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন

হয় নাই। ইচ্ছা করিয়া তিনি ডাক্তারী শিখিয়াছিলেন। স্থলবিশেষে তাঁহার পয়সা লওয়া ছিল, কিন্তু দরিদ্র দেখিলেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। অনেক সময়েই তিনি পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ ও পথ্যের নিমিত্ত নিজে অর্থ দিয়া আসিতেন। গোরাচাঁদ মিত্রের পীড়ার সময় আমরা তাঁহার এ প্রবৃত্তির পরিচয় অনেকটা পাইয়াছি। গোরাচাঁদের মৃত্যুর আট বৎসর পরে ডাক্তার বাবু ফতেপুরের নীচে দিয়া একজন রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন। মিত্রদের ঘাটের কথা শুনিয়াই মাঝিকে বলেন নৌকা রাখিতে। সেখানে নামিয়া যাহা হইয়াছে পাঠক পূর্ব্বাধ্যায়ে তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

রোগী দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার সময়ে নৌকায় বসিয়া ডাক্তারবাবু কেবল জ্ঞানদার কথা আর সেই ছেলেটী ইন্দুর কথা ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায়! মানুষের অবস্থা কখন কি হয় বলা যায় না। ঐ ছেলেটীর এখন এই দশা, কিছু দিন পূর্ব্বে ওরাও এক ঘর মানুষ ছিল। কালাচাঁদ মিত্রের ব্যারামের সময়ে যখন যাই তখন ওদের বাড়ী কেমন গুলজার, আর এখনই বা দেখিলাম কি? আবার হয়ত জগদীশ্বরের কৃপায় ঐ ছেলেটীই মানুষ হবে। ঐ বিধবাই যে হাতে আমার দশটী টাকা পেয়ে এত খুসী সেই হাতে কত লোককে দান ধ্যান করিবে। সংসারে সকলেই এক ভাবে আসে, এক ভাবে যায়, দুদিনের জন্যে কেহ ধনী, কেহবা নির্ধন। আবার ধনী দরিদ্র হইতে বা দরিদ্র ধনী হইতে অধিক সময় লাগে না; কারণও প্রচুর বিদ্যমান রহিয়াছে। তবু কেন দরিদ্রের প্রতি ধনীর সহানুভূতি এত কম? সর্ব্বত্রইত ধনীর আদর, ধনীর

সম্মান। একজন ধনীর সন্তান অতি কদাচারী; হয়ত জগতে যত প্রকার কুকার্য্য আছে তাহার করিতে কিছুই বাকি নাই। সে আসিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইব, কত যত্নে অভ্যর্থনা করিব। আর একজন গরীব লোক, তার স্বভাব হয়ত অতি নির্ম্মল, জীবনে কখন কোন পাপকার্য্য করে নাই, সে কেবল দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। বাড়ীতে একজন অর্থবান লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাহাকে তামাক দিতে একটু বিলম্ব হইলে ভৃত্যকে কত তিরস্কার করিব। আহারের কোন রূপ ত্রুটি হইলে অন্দরে যাইয়া অনর্থ বাধাইব। আর এক জন ভিখারী,—খাটিয়া খাইতে অপারগ। হয়ত দুই দিন তার পেটে ভাত পড়ে নাই। বিনা আহ্বানে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়াছে। দুটি উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্যে লালায়িত। তাহাকে লাটী মারিয়া তাড়াইব। জানিনা মানুষের এ কেমন ব্যবহার!

কামাখ্যা বাবু! জগতে যাহাদের নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আছে তাহাদের সকলেরই মন যদি আপনার ন্যায় হইত, তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবীতে দরিদ্রের হৃদয়-বিদারক রোদন অতি অল্প সময়েই শুনা যাইত।

ডাক্তার বাবু বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই তাহার বড় ছেলে শরৎকে ডাকাইলেন। শরৎ গোবিন্দবেড় স্কুলে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ! ইন্দু নামের একটী ছেলে পড়ে তোমাদের স্কুলে, জান?"

শ। "হাঁ বাবা, সে যে আমাদের সঙ্গেই পড়ে। বড় গরীব ছেলেটী।" ডাক্তার বাবু যেন শরতের মনঃপরীক্ষার্থেই জিজ্ঞাসিলেন—"গরীব কেমন করে জানলে?"

শ। তার কেউ নাই। আছে কেবল এক খুড়ী। তাদের বাড়ী—কি একটা গ্রাম বলে—এখান থেকে দুক্রোশ দূরে। সে রোজ বাড়ী থেকে হেঁটে স্কুলে আসে পড়্‌তে। এখানে থাক্‌বার বাসা খরচ চলে না। জুতা নাই, জামা নাই, আমি যতদিন দেখেছি কেবল এক খানি ধুতি পরা, আর এক চাদর কাঁধে।

ডা। পড়ে কেমন?

শ। তা খুব ভাল। আমাদের ক্লাশের মধ্যে আর তার মতন ছেলে নাই। সব বিষয়ে সমান। অঙ্কেত খুবই ভাল। ও যখন নীচের ক্লাশে পড়ে, তখন দেখেছি ফার্ষ্ট ক্লাশের কোন ছেলে কোন আঁক না পারিলে হেড মাষ্টার মহাশয় ওকে ডেকে নিয়ে যেতেন আর ও গিয়ে সেই আঁক কষে দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশের ছেলেদের লজ্জা দিয়ে আস্‌ত। এই গরমের দিনে যখন স্কুল বসে সকালে, ইন্দু আস্‌তে আস্‌তে পড়া আরম্ভ হয়ে যায়। দুক্রোশ রাস্তা হেঁটে আসিতে হবেত।—ও গিয়ে সকলের নীচে বসে। কিন্তু ছুটার আগে আবার সেই সকলের উপরে। যে করে লেখা পড়া শিখ্‌ছে, সকলেই বলে যে ও খুব ভাল হবে। এই বই, দুচারি আনা দাম হ'লেই কিনতে পারে; বেশী দামের হলে পারে না। তা করে কি, সমস্ত বই টে কাগজে নকল করে নেয়। ইংরেজী পাটীগণিত আমরাত কবে কিনেছি, ও কেবল লিখে নিয়ে চালাচ্ছে। পোষ্ট মাষ্টার বাবুর ছেলে সতীশ যে আমাদের সঙ্গে পড়ে সে ওকে খুব ভাল বাসে।

ডা। তুমি বাস না?

শ। আমিও বাসি। সতীশ করে কি, ওর বাপের কাছ থেকে যত ডাকঘরের অকেজো ফারম সেই গুলি চেয়ে চেয়ে

ওকে দেয়। মাথার ছাপার লেখা গুলি ছিঁড়ে ফেলে সেই রুল টানা কাগজ দিয়ে ইন্দু খাতা বাঁধে। তাইতে ওর সব কাজ হয়। আঁক কষা, বই লিখে নেওয়া। টিফিনের ছুটি হলে সব ছেলে জল খেতে কি খেলিতে যায়। ও সেই সময়ে এক জনের বই চেয়ে নিয়ে বসে বসে নকল করে।

ডা। মাষ্টারেরা তাকে ভাল বাসে ?

শ। খুব। আমাদের স্কুলে পুরা ফ্রী নাই কি না, তাই ও বরাবর অর্দ্ধেক ফ্রী। এবার মাইনে দেবার সময় হেড মাষ্টার মহাশয়কে বল্‌ছিল যে আমাদের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। তাতে তিনি বল্লেন আস্‌ছে মাস থেকে তোমার মাইনে আমি দেব। সামনে পরীক্ষার বছর। আর বর্ষাকালে ওর বাড়ী থেকে আস্‌তে বড় কষ্ট হয়। তাই বলেছেন যে এবার বর্ষাকাল থেকে পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত তুমি আমার বাসায় থেকো। সেকেণ্ড মাষ্টার, থার্ড মাষ্টার সকলেই সমান ভাল বাসেন। বছর দেড়েক হবে, তখন আমরা থার্ড ক্লাশে পড়ি, এক দিন কালেক্টর সাহেব আস্‌বে স্কুল দেখ্‌তে। হেড মাষ্টার মহাশয় বল্লেন সকলে গা ঢেকে বস। ইন্দুর কাঁধে ছিল একখানি ভাঁজ করা চাদর, সে খানি ছেঁড়া। ভিতরে একবারে ঠিক ঠিক টুকুরা টুকুরা হয়ে গেছে। ডেপুটী বাবুর ছেলে কুমুদ সেই চাদর খানা ইন্দুর কাঁধ থেকে টেনে নিয়ে খুলে ফেলে দিয়ে বল্‌ছে দেখেছ হে ইন্দুর চাদর, বলে এই হাসি। মাষ্টার মহাশয় তখন ক্লাশে ছিলেন না।

ডা। ডেপুটী বাবুর ছেলেটা আচ্ছা বানর ত।

শ। তার ঐ রকম। তার পর মাষ্টার মহাশয় লাইব্রেরী

থেকে এসে ঐ দেখ্‌তে পেয়ে— কুমুদ তখন চাদর খানা ফেলে দিচ্ছে—জিজ্ঞেস কল্লেন কি হচ্ছিল? ইন্দু কথা কইল না। সতীশ বলে দিলে—আর যে বকুনি। ক্লাশের সব ছেলের শিক্ষা হয়ে গেল, সেই থেকে আর কেউ ইন্দুকে অমন ঠাট্টা করে না।

ডা। ছেলেটীকে একদিন ডেকে নিয়ে এস 'দেখি আমাদের বাসায়।

শ। কেন বাবা?

ডা। তাকে আমাদের এখানেই রেখে দেব। দুটী খাবে, আর তোমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।

শ। তাহলে বেশ হয়, বাবা। আমার পড়াও ভাল হবে, আর তার সেই কাকীমা তোমাকে কত আশীর্ব্বাদ করিবে।

শরতের শেষ কথাটীতে ডাক্তার বাবু এত সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার অন্তঃকরণে আর আহ্লাদ ধরিল না। "তা তুমি কেমন করে বুঝিলে?" বলিয়াই শরতকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন, এবং তাহার মুখে একটী চুম্বন দিয়া কহিলেন এই রূপ বুদ্ধিই যেন চির কাল থাকে।

সোহাগের পুতলি পুত্রের মুখে মনের মতন একটী কথা শুনিতে পাইলেও কয়জন পিতার হৃদয় আনন্দে উছলিয়া না উঠে? কয় জনেরই বা বাৎসল্য রসে গলিয়া বুড়াছেলেকেও কোলে তুলিয়া চুম্বন দিতে ইচ্ছা না হয়? কিন্তু হায়! জগতে অনেক ছেলেই বাপের মনোমত কথা বলা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে এমন এক এক মর্ম্মভেদী কার্য্য করে যে তাহাতে এমন স্নেহময় পিতারও মনে হয় যে অমন পুত্র সম্মুখে না থাকে সেই ভাল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আবার গৌরহরি রামজয়।

"অকারণাবিষ্কৃত বৈরদারুণাৎ
অসজ্জনাৎ কস্য ভয়ং ন জায়তে।
বিষং মহাহেরিব যস্য দুর্ব্বচঃ
সুদুঃসহং সন্নিহিতং সদা মুখে।"

পাঠক এইবার একবার গৌরহরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীটী দেখিবেন, চলুন। গৌরহরির বাড়ীটী একবারে ফতেপুরের উত্তরপ্রান্তে। ব্রাহ্মণ পাড়ায় মানুষের মধ্যে এক গৌরহরি। আর যে দু ঘর ব্রাহ্মণ আছে তার একবাড়ীতে একটী নাবালক ছেলে, অন্য বাড়ীতে একটী বিধবা স্ত্রীলোক মাত্র। গৌরহরির দুদশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি আছে; এছাড়া যজমান অনেক। বাড়ীটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাহিরের ঘরের নিকটে একখানি ক্ষুদ্র চালা, তাহাতে লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহ আছেন। গৌরহরির

থেকে এসে ঐ দেখ্‌তে পেয়ে— কুমুদ তখন চাদর খানা ফেলে দিচ্ছে—জিজ্ঞেস কল্লেন কি হচ্ছিল? ইন্দু কথা কইল না। সতীশ বলে দিলে—আর ো বকুনি। ক্লাশের সব ছেলের শিক্ষা হয়ে গেল, সেই থেকে আ কেউ ইন্দুকে অমন ঠাট্টা করে না।

ডা। ছেলেটীকে একদিন ডেকে নিয়ে এস দেখি আমাদের বাসায়।

শ। কেন বাবা?

ডা। তাকে আমাদের এখানেই রেখে দেব। দুটী খাবে, আর তোমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।

শ। তাহলে বেশ হয়, বাবা। আমার পড়াও ভাল হবে, আর তার সেই কাকীমা তোমাকে কত আশীর্ব্বাদ করিবে।

শরতের শেষ কথাটীতে ডাক্তার বাবু এত সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার অন্তঃকরণে আর আহ্লাদ ধরিল না। "তা তুমি কেমন করে বুঝিলে?" বলিয়াই শরতকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন, এবং তাহার মুখে একটী চুম্বন দিয়া কহিলেন এই রূপ বুদ্ধিই যেন চির কাল থাকে।

সোহাগের পুতলি পুত্রের মুখে মনের মত একটী কথা শুনিতে পাইলেও কয়জন পিতার হৃদয় আনন্দে উছলিয়া না উঠে? কয় জনেরই বা বাৎসল্য রসে গলিয়া বুড়াছেলেকেও কোলে তুলিয়া চুম্বন দিতে ইচ্ছা না হয়? কিন্তু হায়! জগতে অনেক ছেলেই বাপের মনোমত কথা বলা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে এমন এক এক মর্ম্মভেদী কার্য্য করে যে তাহাতে এমন স্নেহময় পিতারও মনে হয় যে অমন পুত্র সম্মুখে না থাকে সেই ভাল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আবার গৌরহরি রামজয়।

"অকারণাবিষ্কৃত বৈরদারুণাৎ
অসজ্জনাৎ কস্য ভয়ং ন জায়তে।
বিষং মহাহেরিব যস্য দুর্ব্বচঃ
সুদুঃসহং সন্নিহিতং সদা মুখে।"

পাঠক এইবার একবার গৌরহরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীটা দেখিবেন, চলুন। গৌরহরির বাড়ীটী একবারে ফতেপুরের উত্তরপ্রান্তে। ব্রাহ্মণ পাড়ায় মানুষের মধ্যে এক গৌরহরি। আর যে দু ঘর ব্রাহ্মণ আছে তার একবাড়ীতে একটী নাবালক ছেলে, অন্য বাড়ীতে একটী বিধবা স্ত্রীলোক মাত্র। গৌরহরির দ্বাদশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি আছে; এছাড়া যজমান অনেক। বাড়ীটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাহিরের ঘরের নিকটে একখানি ক্ষুদ্র চালা, তাহাতে লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহ আছেন। গৌরহরির

এক মাত্র পুত্র রমানাথ, তাহার বিবাহ হইয়াছে। অনেক দিন হইল গৌরহরির স্ত্রীর কাল হইয়াছে। কিন্তু বউটী ছোট, তাহার দ্বারা সংসারের কার্য্য সুচারু রূপে চলে না বলিয়া গৌরহরি এক নাপিত যজমানের অর্দ্ধ বয়স্কা কন্যাকে বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বাংশে সেই বাড়ীর গৃহিণীর ন্যায়। রমানাথ কিম্বা তাহার স্ত্রীর সেই নাপিতনীর আদেশ লঙ্ঘন করিবার যো নাই। মোটামুটি খরচপত্র যা কিছু সব তারই হাতে। গৌরহরি বলেন উমা আমার বড় হিসেবী। চুণ রতি নষ্ট হ'তে দেয় না। ক্ষৌরকারনন্দিনীর নাম উমা। রাত্রিতে গৌরহরি যে ঘরে শোন, উমা তার বারাণ্ডার এক কোণে পড়িয়া থাকে। দরকার মত ডাকিতে হাঁকিতে একটা লোক পাওয়া চাইত। গৌরহরি লোককে বুঝান,—"উমার ঘুম বড় সাবারণ। রেতের বেলা ও বড় সজাগ। আমার একটু প্রস্রাবের ব্যারাম আছে। তা যতবার বেরুব, সাড়া পেতেই উমা এসে গাড়ুটী সাম্‌নে ধর্‌বে। আমাকে অন্ধকারে হাৎড়ে মরতে হয় না। গায়ে ব্যাথা হলে যতক্ষণ আমার ঘুম না ধরে উমা গিয়ে বসে গা টিপে দেবে। সার্থক যজমানের মেয়ে; ওর আর জন্ম হবে না। যে করে সেবাটা কল্লে আমার।—" গ্রামের ছোটলোকগুল—গৌরহরির সেই গরু ভেড়াগুল—এতে কিছু দুএকটী ছোট কথা বলিতে ছাড়িত না। যেদিন উমা নাপ্‌তিনী এসে গৌরহরির ঘর ঢুকিল, সেই দিনই অনেকে বলাবলি করিল "বুড়া বয়সে ভট্টাচার্য্যের কাণ্ডটা দেখ।"

সন্ধ্যা হয় গৌরহরি বাহিরের ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া মৌতাতের আপিমটুকু ঠিক করিতেছেন, এমন সময়ে রামজয়

বসু আসিয়া দেখা দিলেন। "প্রণাম, কি হচ্চে মশাই ?" বলিয়া একটু দূর হইতেই রামজয় অভিবাদন করিলেন। "আসুন, এই আফিমটুকু খেয়ে সন্ধ্যায় বসিব তার উদ্যোগ কচ্ছি" বলিয়া গৌরহরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া রামজয়ের আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রামজয় বসিলে গৌরহরি আরম্ভ করিলেন, "কি পাজি জিনিসই নেশা ; সেবার সেই পেটের অসুখটা সারিবে বলিয়া সকলেই পরামর্শ দিলেন একটু একটু আপিম খান। এখন ধরিয়া দেখি আর ছাড়া দায়। যে দিন না খাই অমনি পেট ফাঁপে, হাত পা জ্বালা করে।" রামজয় জানিতেন গৌর হরিকে আপিম খাইতে কেহই পরামর্শ দেয় নাই, কিন্তু তাহা বলিলে গৌরহরির কথা খণ্ডন করা হয় ভাবিয়া কহিলেন, "তা হ'লই বা, আপনি ত আর বেশী খান না। অমন বুড়া বয়সে একটা না একটা চাই।"

গৌ। হাঁ তাত বটেই। খাওয়া আমার এই দুই রতি করে। এক পয়সার আপিম হলে আমার দুদিন যায়।

রামজয় "যাই, একবার ঠাকুর ঘরটায় নমস্কার করে আসি।" বলিয়া উঠিলেন, এবং পার্শ্বের সেই ক্ষুদ্র চালার দাওয়ায় একবার মাথা ছোঁওয়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

এই সময়ে রমানাথ এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিয়া হাজির করিল। রামজয় ও গৌরহরি উভয়ে তামাক টানিতে লাগিলেন।

দুএকবার কলিকাটী ফিরা ঘুরার পর রামজয় আরম্ভ করিলেন, "শুনেছেন, সে দিন সেই ডাক্তারটা এসে বেটীকে কতগুলো টাকা দিয়ে গেছে। আবার গোবিন্দবেড়ে গিয়ে

নিজের ছেলেকে দিয়ে ডাকিয়ে ইন্দুকে নিয়ে আপনার বাসায় রেখেছে। বলেছে যতদিন এখানে পড়া চলে তুমি এইখানে থেকেই পড়িবে। ওখানেত এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়া চলিবে। তা হলেই বেটার পোওয়া বার। এণ্ট্রান্সটা পাশ কর্ত্তে পারিলে ত ছেলেটা মানুষ হবার গতিক হয়ে উঠিবে। ডাক্তার ত আর নড়্ছে না, সেবার সেই তাঁতি ডেপুটীর সঙ্গে ঝগড়া করে সরকারী চাকরী ত ছেড়েই দিয়াছে। যে পশারটা জমিয়েছে, শুন্তে পাই লোকে ওকে পেলে আর কাউকে ডাকে না। রাজঘাটের বৈদ্যদের পর্য্যন্ত অন্ন মেরেছে।

গৌ। লোকটার যে গুণ ঢের। কোনখানে পয়সা নেয়, আবার যায়গা বিশেষে শুন্তে পাই পয়সা দিয়েও যায়।

রা। তা আর এতে বুঝ্তে পাচ্ছেন না? কবে ওদের বাড়ীতে চিকিৎসা কর্ত্তে এসেছিল, আর তাই মনে করে বসে আছে। আবার কিনা অমনি টাকা দেওয়া।

গৌরহরি একটীবার মাথা চুলকাইয়া—একটী বার সেই সাদা গোঁফে তা দিয়া—একটু বাদে বলিলেন ঃ—

বেশ হয়েছে! একটা কাজ কর্ত্তে পারিবেন? পারিবেনই বা বল্‌ছি কেন? কর্ত্তেই হবে।

রা। কি করিব বলুন।

গৌ। আপনার একটী মেয়ের বিবাহ না?

রা। হাঁ সোদামিনীর বে বটে, এই ফাল্গুন মাসেই বোধ হয় হবে।

গৌ। কর্ত্তে হবে কি জানেন? সেই বিবাহের দিন ঐ ছেলেটাকে নিমন্ত্রণ করা। তারপর সেই সভার মাঝখান থেকে

তুলে দেওয়া। সেইখানেই রটিয়ে দেওয়া যে, ওর খুড়ীর গোবিন্দ বেড়ের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কিছু আছে।

রা। নিমন্ত্রণ প্রথম থেকে বাদ দিলেই ত হয়।

গৌ। তবেই ত বুঝিলেন খুব। তা হলে মর্ম্মান্তিক হবে কেন? প্রথমে কিছুই না আঁচ্ দেওয়া। যেমন সমাজের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে তেমনি ওদেরও বলা; তার পর বিবাহের মজ্‌লিসে ঐটা ব্যক্ত করা।

রা। মন্দ ঠাওরান নাই; কিন্তু শুনেছি ও বেটী ডাক্তারের সাম্‌নে বেরোয়ও নাই। ও বলে ঘরের ভিতরেই ছিল, আর ডাক্তার দাঁড়াইয়া বাহিরের উঠানে।

গৌ। তা কি আমিই শুনি নাই? কিন্তু এটা করিলে লাগিবে ঠিক। টাকা যে দিয়াছে একথা গ্রামময় রাষ্ট্র। টাকা কি মানুষে অমনি দেয়? তাতে মাগীর বয়স টাট্‌কা। রূপও আছে। একটু ধরিয়ে দেওয়া মাত্র। এ কথা সকলেই বিশ্বাস করিবে। দেখিবেন আপনি, যতকিছু কল কৌশল সব চেয়ে সেরা হবে এইটী! মাগী কাঁদিতে কাঁদিতে বাপ বাপ করে গ্রাম ছেড়ে পালাবে এখন। ভাল মেয়ে মানুষের চরিত্রে কলঙ্ক দিলে তার মনে যেমন কষ্ট হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। এইটেই ঠিক করুন।

রা। ঠিক করাকরি আর কি, আপনিই সব করিবেন; নিমন্ত্রণও করিবেন আপনি, আর সভার মধ্যে ওটা ব্যক্ত করিবার ভারও আপনার উপর রইল।

গৌ। আচ্ছা, তা আমি পারিব। কিন্তু দেখিবেন যেন এখন একথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়।

রা। মহাভারত! কায আপনার না আমার।

গৌ। তা ত ঠিকই, ওটা বলাই আমার অধিকন্তু।

"আজি তবে উঠি, প্রাতঃপ্রণাম" বলিয়া রামজয় গাত্রোত্থান করিলেন। গৌরহরিও "কল্যাণমস্তু, আচ্ছা আস্থন তবে" বলিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

গৌরহরির শেষ বাণ।

"রোহতে সায়কৈর্ব্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং
বাচা দুরুক্তয়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতং।

নিরূপিত দিবসে রামজয়ের কন্যার বিবাহ হইল। যেমন ঠিক ছিল ইন্দুর প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করা হইল। বালক কিছুই জানে না। বিবাহের সভায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে গৌরহরি ভট্টাচার্য্য আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন এবং একটু দূরে উঠাইয়া লইয়া গিয়া কহিলেন, "ইন্দু, তুমি বাড়ী যাও।"

ই। কেন, কাকী মা ডাকছেন্?

গৌ। না, তোমাকে ভুলে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। এঁরা কেউ তোমার সঙ্গে খাবেন না।

ইন্দু কিছুই বুঝিতে পারিল না। চমকাইয়া বলিল কেন ?

গৌ। সে আর শুনে কি করিবে ? সেই যে তোমাদের বাড়ীতে ডাক্তার বাবু এসেছিলেন তাতে তোমার কাকীমার নামে একটা অপবাদ উঠেছে।

ইন্দুর মস্তকে যেন একবারে শত বজ্রপাত হইল। দুঃখে এবং অপমানে ম্রিয়মাণ হইয়া সে বাড়ী পানে ছুটিল এবং "কাকী মা, আমি শুই গে" এই বই আর কিছু না বলিয়া একবারে যাইয়া বিছানার উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। বালিশে তাহার চক্ষের জল গড়াইতে লাগিল। ইন্দুর মনে হইতে লাগিল যেন এ বিছানা হইতে তাহাকে আর মুখ উঠাইতে না হয়।

এদিকে ইন্দু উঠিয়া আসিবার পরই সভায় ইনি উনি তিনি গৌরহরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কথাটা কি ? ভট্টাচার্য্য সকলকেই বলিলেন। তাহার ইচ্ছাই ত কথাটা রটাইয়া দেওয়া।

ফতেপুরের সমাজ অন্যান্য গ্রামের কায়স্থ লইয়া। তাহারা দু এক জন গৌরহরির কথা বিশ্বাস করিলেন, আবার দু একজন যাহারা গৌরহরির স্বভাব জানিতেন তাঁহারা বিশেষ সন্দেহই করিলেন। কিন্তু ফতেপুরের মধ্যে লোকই রামজন। তিনি যদি ইন্দুকে ছাড়িলেন তবে আর আমাদের কেন মাথা ব্যথা এই ভাবিয়া তাঁহারাও চাপিয়া গেলেন। দু একজন বৃদ্ধ কেবল বলিল, "আহা! ছেলেমানুষ, আজিকার মতন না হয় দুটী খেয়েই যেত। ওর সঙ্গে আবার দল কি ? মুখটা চুণপানা করে উঠে গেছে।"

জ্ঞানদা বারাণ্ডায় বসিয়া খানিকটা তেঁতুলের বিচি ছাড়াইতে ছিলেন, ইন্দুকে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই বটি ফেলিয়া

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন এবং তাঁহার সেই অমিয় মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা এর মধ্যেই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল ?"

ইন্দু জড়িত স্বরে উত্তর করিল "না"—

জ্ঞা। তুমি কি কাঁদছ ? কেন কি হয়েছে ?

ই। না কিছু হয় নি, তুমি শোও এসে—

জ্ঞা। আমাকে লুকাচ্ছ কেন বাবা ? মুখ তোল দেখি।

ই। এ মুখ আর তুলিব না।

জ্ঞানদা বুঝিলেন, গুরুতর কিছু না হইলে ইন্দুর মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইত না। জিজ্ঞাসিলেন কি হয়েছে বল না ?

ইন্দু তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিল "আমাকে সভার মাঝখান থেকে তুলে দিয়েছে।"

জ্ঞা। তুলে দিয়েছে ? বলাই বা কেন, আর তুলে দেওয়াই বা কেন ? কে তুলে দিলে ?

ই। গৌরহরি ভট্টাচার্য্য।

জ্ঞা। কি বলে তুলে দিলে ?

ই। যা বলেছে তা মানুষে বলে না।

জ্ঞা। কি বলেছে ?

ই। আমি তা বলিতে পারিব না। ইন্দুর মনে হইতে লাগিল এই সময়ে আমার বাক্‌শক্তি রহিত হইত।

জ্ঞানদা বলিলেন, বল না বাবা, আমায় বল্‌তে কি আর দোষ আছে?

ই। তোমার দোষ দিয়েছে !

জ্ঞা। কি দোষ ?

ই। সেই যে ডাক্তার বাবু আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন।

জ্ঞানদা বুদ্ধিমতী ; তাঁহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। এমন কথা মানুষে বলিতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। উঃ—বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। পাষণ্ড গৌরহরি সম্মুখে থাকিলে সতীর এ উত্তপ্ত নিশ্বাসে বোধ হয় দগ্ধ হইয়া যাইতেন। জ্ঞানদা অনেকক্ষণ একবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বর্ষণের পূর্ব্বে আকাশের ছিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ডগুলি যেমন একত্র হইয়া আইসে সেইরূপ জ্ঞানদার অন্তঃকরণে রাশি রাশি মেঘ একত্র হইতে লাগিল। আপনার অসহায় অবস্থা এবং অন্যের এই অমানুষিক ব্যবহার ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় যেন দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। গোরাচাঁদের মৃত্যুর পর এদিকে তিনি অনেক দিন ফুকারিয়া কাঁদেন নাই, কিন্তু আজি আর প্রাণে ধৈর্য্য মানিল না। তিনি চেঁচাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "কোথা গেলে গো, একবার উঠে এসে দেখে যাও গো, কি গ্রামে আমায় ফেলে গেছ গো, কি কষ্টে আমি ভিটায় আছি গো,—ইন্দুর আমার মনে কত ব্যথা গো,—আর ত সহ্য হয় না গো,—শ্বশুরের ভিটার বাতি বজায় রাখ্‌তে বুঝি পারি না গো—উঃ, প্রাণ যে ছুটে যায় গো"

ইন্দু "কাকী মা চুপ কর, চুপ কর" বলিয়া তাঁহার মুখে হাত দিয়া থামাইতে চেষ্টা করিল।

জ্ঞানদা একটু থামিয়া থাকিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং জগদীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! তোমায় ত লোকে অনাথনাথ বলে বাবা! আমাদের চেয়ে

অনাথ কি আর ব্রহ্মাণ্ডে আছে বাবা ? এত যে কষ্ট পাচ্ছি তাও কি দেখ্‌তে পাওনা বাবা ! মুখ তুলে কি একবার চাইবে না বাবা ! বুক যে ফেটে যায় বাবা—উঃ—”

ইন্দু আর কাকীমাকে থামাইবে কি, ফুলিয়া ফুলিয়া নিজেই কাঁদিতে লাগিল।

পার্শ্বস্থ বৃক্ষলতাদির যদি চেতনা থাকিত তাহা হইলে এই রাত্রিতে এই অনাথ পরিবারের ক্রন্দন শুনিয়া নিশ্চয়ই তাহারাও কাঁদিত। ওদিকে অদূরে রামজয় বসুর বাড়ীতে কন্যার বিবাহ। গ্রামের অধিকাংশ লোকই সেখানে। শতাধিক হস্ত পরিমিত স্থানের মধ্যে একস্থলে বিবাহের আমোদ, অন্যত্র মর্ম্মপীড়িতা রমণীর সকরুণ রোদন! জগতের দৃশ্যই এইরূপ বিচিত্র!

গোরাচাঁদ! তোমার আত্মার যদি শুনিবার ক্ষমতা থাকে তবে এ ক্রন্দন তুমি অবশ্যই শুনিতে পাইয়াছ।

জগদীশ! অবলার এ হৃদয়ভেদী নৈশ আর্ত্তনাদ কি তোমার পদপ্রান্তে পঁহুছাইবে না ?

সে রাত্রিতে জ্ঞানদা আর বিছানায় পাশ দিলেন না। ইন্দু তাহার কোলের কাছে শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি শেষে জ্ঞানদা ভাবিতে লাগিলেন, “আমি যদি এমন পাগল হই, ইন্দু ত একবারেই গলিয়া যাইবে। করুক লোকে যার যা ইচ্ছা।”

পরদিন প্রভাতে জ্ঞানদা ইন্দুকে বুঝাইতে লাগিলেন, “ও কিছু মনে করোনা বাবা, জগদীশ্বর আছেন, তিনিই জানিবেন। আমাদের নিয়ে আর দল কি ? আমি ত আর কাউকে ডাকিতে পারিব না। যখন সেদিন হবে, তখন কত লোক পাওয়া যাবে।

যারা এখন এমন ব্যবহার কচ্ছে তারাও অন্য রকম হবে। বাবা তুমি যদি বেঁচে থাক, আর মানুষ হও, আমার কোন দুঃখই থাক্‌বে না। হারে দিন! ভগবান কি সেদিন দেবেন?"

ইন্দু জ্ঞানদার গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল "আমার কাকীমা কি মানুষ?"



পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ইন্দুর উন্নতির সূত্রপাত।—সুখের আলো।

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।"

আভাস দেওয়া হইয়াছে যে ইন্দু ডাক্তার কামাখ্যা বাবুর বাসায় গিয়াছে। পুত্রের সহিত ডাক্তার বাবুর যে দিন কথোপকথন হয়, তাহার পরদিনই শরৎ ইন্দুকে বাসায় ডাকিয়া নিয়া আইসে। কাকীমার মুখে ইন্দু ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়াছিল। তাঁহার মুখ দেখিয়াই বালকের হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় উছলিয়া উঠিল। ইন্দুকে দেখিয়া ডাক্তার বাবুরও প্রাণ গলিয়া গেল। দারিদ্র্য জনিত কাতরতার সহিত সরলতার চিহ্ন যে মুখে বর্ত্তমান, হৃদয় থাকিলে সে মুখ দেখিয়া মানুষ না টলিয়া থাকিতেই পারে না। দু এক কথার পরই ডাক্তার বাবু ইন্দুকে বলিয়া দিলেন,

"তোমাকে আর হাঁটিয়া বাড়ী হইতে আসিতে হইবে না। এখানে শরতের সঙ্গে থাকিবে, আর পড়িবে।"

ইন্দু এখন কেবল শনিবার শনিবার বাড়ী যায়। সোমবার সকালে আবার গোবিন্দবেড়ে আইসে। কোন বিশেষ কাজ থাকিলে অথবা জ্ঞানদা বলিয়া দিলে অন্যবারেও ইন্দু কখনও কখনও বাড়ী যায়। রামজয়ের কন্যার বিবাহ হয় বুধবারে। তৎপূর্ব্ব সোমবারে জ্ঞানদা, ইন্দু বাড়ী হইতে আসিবার সময়, বলিয়া দেন "বুধবারে ওদের সৌদামিনীর বিবাহ; আসিবে সেদিন, ওরা নিমন্ত্রণ করেছে। যে যেমনই দেখুক আমাকে সকলেরই মন রেখে চলিতে হয়। যে সময়! না এলে হয় ত ওরা ঐ নিয়ে কত কথা করিবে এখন।" এই অনুরোধেই ইন্দু বুধবার বৈকালে বাড়ী আসিয়া ছিলেন। আসিয়া যে ফল হইয়াছে পাঠক তাহা জানেন। এই ঘটনার পর হইতেই কিন্তু ইন্দুর হৃদয়ে অভিমানজনিত এক নূতন বল প্রবেশ করিল। ইন্দু এখন আর বালক নাই, সবই বুঝিতে পারে। রামজয় বসুর বাড়ীর সেই অপমান—গৌরহরি ভট্টাচার্য্যের বাঁকা মুখ—তাঁহার মনে প্রতিনিয়তই খেলিতে লাগিল। অন্যদিকে জ্ঞানদার সেই জ্ঞান-প্রদায়িনী কথা গুলি। ইন্দুর কেবল মনে হইতে লাগিল যেমন করিয়া পারি লেখা পড়া শিখিব, মানুষ হইব, কাকীমার দুঃখ ঘুচাইব। সে একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নে রত হইল। প্রত্যহ দুই ক্রোশ, দুই ক্রোশ চারি ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়াও যে পড়িতে পারিত এবং স্বশ্রেণীর মধ্যে সকলের উপরে থাকিত, সে এখন গোবিন্দবেড়েই আশ্রয় পাইয়াছে। আর চাই কি? পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্ব হইতেই ইন্দু বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল। যথাসময়ে

পরীক্ষা গৃহীত হইল। ইন্দু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজধানী বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল। মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি হইল। জ্ঞানদার আহ্লাদের সীমা রহিল না। পাঁচটী টাকা তাঁহার কাছে পাঁচ শত মুদ্রা বলিয়া বোধ হইল।

সময় ফিরিলে লোকের সকল দিকেই সুবিধা হয়। জ্ঞানদার সংসারে একটু একটু আশার আলো দেখা দিয়াছে। রামজয় যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল। ইন্দু মাইনরে বৃত্তি পাইয়া বিনা বেতনে এণ্ট্রেন্স স্কুলে পড়িতে লাগিল। আহারাদি ডাক্তার বাবুর বাসাতেই চলিতেছে। জ্ঞানদার এক একবার মনে হইত এখন আর কেন, ইন্দু ত বাসা খরচ করিয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার মুখে ডাক্তার বাবুর, তাঁহার স্ত্রীর ও শরতের যে যত্ন ও ভালবাসার কথা শুনিতেন তাহাতে আর বলিতে প্রবৃত্তি হইত না যে, ইন্দু পৃথক বাসা করিয়া থাকে। জ্ঞানদা ভাবেন, ডাক্তার বাবু যদি দুঃখিত হন। অমন উপকারী বন্ধু কি আর হয়? সে যায়গায় ইন্দুর কখনই অযত্ন হইবে না। ওরকম ভাবিলেও বোধ হয় পাপ আছে। ফলতঃ এমন দিনই যায় নাই যেদিন জ্ঞানদা ডাক্তার বাবুকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া, তাঁহার নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া জল গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংরাজী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম চারি দিন যাইতেই ইন্দু বৃত্তির প্রথম পাঁচটী টাকা পাইল, এবং পরের শনিবারেই বাড়ীতে আসিয়া জ্ঞানদার হাতে টাকা কয়েকটী দিয়া কহিল;— "কাকীমা আমার সাত টাকার বই কিনতে হবে, এমাসে তিন টাকা দিলেই চলিবে।" জ্ঞানদা একটী টাকা দেবতার উদ্দেশে

রাখিয়া দিয়া কহিলেন, "সব আমার কাছে এনে দিও না বাবা। আমার বাড়ীর খরচ এতদিন চলেছে এখনও একরকম চলে যাবে, তোমার কাপড় চোপড় যা কিনিতে ইচ্ছা যায় কিনো। তুমি নিজে না কিনিলে কে তোমায় করে দেবে বাবা ? আমি কাকে দিয়া কেনাব ? আজি যদি রঘু থাকিত।" রঘুর কথা মনে আসিতেই জ্ঞানদার চক্ষু দিয়া [illegible] আসিল। "আজি যদি রঘু থাক্‌ত তার মনে কত সুখই [illegible]। তোমাকে সকাল বেলা সেই ভীমনগরের ছেলেটীর [illegible] দিয়া আসিত আবার বৈকাল বেলা হলে সেখান থেকে গিয়ে নিয়ে আস্‌ত। সেই একদিন আর এই একদিন। রঘুরে! আজি একবার উঠে আয় রে! দেখে যা তোর ইন্দু দাদা পরীক্ষা দিয়ে জলপানি পেয়েছে। তুই যে ওকে কত ভাল বাস্‌তিস্ রে, ওর জন্যেই ত প্রাণটা পর্য্যন্ত খোয়ালি রে!" জ্ঞানদা জোরে কাঁদিতে লাগিলেন। ইন্দুও কাঁদিল। জিজ্ঞাসা করিল "কাকী মা, রঘু দাদা মরে কিসে ?"

জ্ঞানদা এতদিন যাহা বলেন নাই আজি তাহা বলিলেন। গৌরহরি রামজয়ের ষড়যন্ত্র রামজয় কর্ত্তৃক ব্রজা চাঁড়ালের নাম উচ্চারণ, কিছুদিন পরেই রঘুর মৃত্যু, প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইল। অক্রোধী ইন্দুর মুখেও যেন ক্রোধের চিহ্ন প্রতিভাসিত হইল। বালকের মনে গৌরহরি ও রামজয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া গেল।

ইন্দু বাড়ী হইতে যাইবার সময় জ্ঞানদা তাহার হাতে তিনটী টাকা দিয়া কহিলেন, এই দিয়ে তোমার বই কিনো। একটী টাকা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের জন্যে রেখেছি। বাকি টাকাটী

রঘুর স্ত্রীকে দিব এখন। ওদের এখনও কষ্ট যাচ্ছে। পেয়ে কত খুসী হবে। আস্‌ছে মাসে বইয়ের দাম আর চারি টাকা দিও। তার পরে বাবা একজোড়া জুতা, একটা ছাতা, আর একটা জামা করো। এক মাসের টাকা হলেই হবে এখন। আমায় তুমি মাসে দু টাকা করে দিলেই ভেসে যাবে। তার মধ্যে আমি রঘুর স্ত্রীকেও কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারিব।

এ আদেশ কিন্তু ইন্দু সম্পূর্ণ প্রতিপালন করে নাই। নিজের যাহা না হইলে নয় কেবল এইরূপ জিনিসই সে কিনিত বাকি যাহা থাকিত সমস্ত কাকীমার হাতে আনিয়া দিত। জ্ঞানদা সেই প্রথম বারের ন্যায় জিদ্ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার জামাটী জুতাটী কিনিয়া দিতেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

—oo—

জ্ঞানদার সুখ।

"সুখমাপতিতং সেবেদ্দুঃখমাপতিতং বহেৎ
কাল প্রাপ্তমুপাসীত শস্যানামিব কর্ষকঃ।"

জ্ঞানদার সংসারের হাওয়া ফিরিয়াছে। সুখের বাতাস বহিয়াছে। এইবার শীঘ্র শীঘ্র সারি। ইন্দু দুই বৎসর পরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চৌদ্দ টাকা বৃত্তিলাভ করিলেন। ইহার পর ইন্দু কলিকাতায় পড়িতে আসিলেন। দুই বৎসরে এল্, এ, পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ স্থান লাভ করিলেন। মাসিক বত্রিশ টাকা বৃত্তি হইল। আর দুবৎসর যাইতে তিনি বি, এ পরীক্ষা দিলেন, তাহাতে মাসে পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি মিলিল। ইহার এক বৎসর পরে এম্, এ পাশ করিয়া ইন্দু একশত টাকা বেতনে মাষ্টারি আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। ডাক্তার কামাখ্যা বাবুই সম্বন্ধ স্থির করেন। শুভদিনে

শুভক্ষণে জ্ঞানদা নববধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। ফতেপুরের বাড়ীর এখন শ্রী ফিরিয়াছে। আবার সাত আটখানি ঘর হইয়াছে।

বিবাহের দুই বৎসর পরে ইন্দু আইন পরীক্ষা দিলেন এবং উকীল হইয়া রাজপুর জেলায় আসিলেন। জ্ঞানদা মধ্যে মধ্যে রাজপুরের বাসায় আসেন; কিন্তু অধিকাংশ সময় ফতেপুরেই কাটান। তাঁহার জন্যে সংসারের কিছুই ইন্দুকে দেখিতে হয় না। রাজপুরে ইন্দু এক প্রকাণ্ড বাড়ী খরিদ করিয়াছেন। ছসাত বৎসরের মধ্যে ইন্দুর পসার এমন জমিয়া গিয়াছে যে তিনি সকল সময়ে সকল মক্কেলের কাজ লইতে পারিতেন না। গরীব দেখিলে ইন্দু বিনা পয়সায় তাহার কাজ করিয়া দিতেন। লোকে তাহাকে পাইলে অন্য কাহারও নিকট যাইত না। কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ সকলের কাছেই ইন্দু আদরণীয়। সকলের নিকটেই তাঁর সমান প্রতিপত্তি। লোকে এখন একবাক্যে বলে ইন্দু রাজপুরের উকীল সম্প্রদায়ের মাথা।

ইন্দু বার তেরটী গরীবের ছেলেকে খাইতে পরিতে দেন ও তাহাদের পড়িবার ব্যয় বহন করেন। ভিখারী কিম্বা অতিথি আসিলে তাহাকে ফিরান নাই। আহারের নিয়ম সকলের পক্ষেই একরূপ। বাড়ীর মনিব ইন্দু যা খাবেন স্কুলের ছেলেরাও ঠিক তাই খাবে। ওলপুরের ভাণ্ডারী মহাশয়ের মত কর্ত্তার ছেলেকে একটী সন্দেশ আর তার কাছেই আর একজনকে আধখানি এ প্রথা ইন্দুর বাড়ীতে নাই। ছেলে বেলায় অনেকদিন দুধ খাইতে পাই নাই এখন আমার বাসার যেন প্রত্যেকেই প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খাইতে পারে এই ভাবিয়া ইন্দু বাসাতে

ছ সাতটী দুগ্ধবতী গাভী রাখিয়া দিয়াছেন। জ্ঞানদা রাজপুরের বাড়ীতে আসিয়া এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যে কি আনন্দ লাভ করিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার শক্তি আমাদের নাই।

ফতেপুরের বাড়ীতে এখন অট্টালিকা। ইন্দু সমস্ত বৎসর রাজপুরে কাটাইয়া দুর্গোৎসব পূজার সময় বাড়ীতে আসেন। রীতিমত জাঁক জমকের সহিত পূজা হয়। ইন্দুর চারি পাঁচটী সন্তান হইয়াছে। বড় ছেলে প্রফুল্ল জ্ঞানদার সঙ্গে থাকে। সে ঠাকুরমার এত ন্যাওটো যে মা বাপকে চায় না। জ্ঞানদা তাহাকে ঘোর আহ্লাদে করিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে তিনি যাইবেন ছেলেটী আঁচল ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

জ্ঞানদা এখন ফতেপুরেই থাকুন, আর রাজপুরেই যান, অনেক লোক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই নমস্কার করে। এমন মাস যায় নাই যে গ্রামের বা দেশের একটী লোকও তাঁহার কাছে গিয়া দুঃখের কান্না কাঁদে নাই। অনেকেরই প্রার্থনা যে জ্ঞানদা ইন্দুকে বলিয়া কি তাঁহার নিকট একখানি চিটি দিয়া তাহার একটী চাকরী করিয়া দেন। ইন্দু সাহেব সুবা হাকিম প্রভৃতিকে বলিয়া অনেক অন্নহীনের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন।

পূজার সময়ে ইন্দু বাড়ী আসিয়াছেন। মহা সমারোহে পূজা হইতেছে। নীচে উঠানে লোক খাইতেছে। জ্ঞানদা উপরে বসিয়া জানালা দিয়া তাহা দেখিতেছেন। প্রফুল্ল তাহার কাছে আছে। ইন্দু সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যেমন জিজ্ঞাসিবেন 'কাকীমা, ব্রাহ্মণদের বিদায় দিব কত করিয়া'? অমনি দেখেন জ্ঞানদার চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছে।

'কাকীমা কাঁদছ কেন ?' বলিয়া ইন্দু নিকটে দাঁড়াইলেন।

জ্ঞা। বড় কষ্ট হচ্ছিল মনে, বাবা। কান্না পাচ্ছিল আপনা আপনি। এত যে সুখ হয়েছে তোমার এখন—এ এঁরা কেউ দেখ্‌লেন না। আজি যদি দিদি, বট্‌ঠাকুর কি এঁরা কেউ থাক্‌তেন, তাঁদের মনে কি আহ্লাদ হ'ত।

জ্ঞানদার চিত্ত উছলিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন "ওগো একবার এসে দেখে যাও গো—তোমাদের সেই অনাথ ইন্দু আজি কত অনাথকে অন্ন দিচ্ছে গো—ফতেপুরের সেই বাড়ীতে আজি কত সেজ্ জ্বল্‌ছে গো—কেবল দুঃখের বোঝাই বইতে এসেছিলে গো—"

'চুপ কর কাকীমা,' বলিয়া ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক সেই ছেলে বেলার মত জ্ঞানদার মুখে হাত দিলেন।

জ্ঞানদা চুপ করিয়া একটু বাদে কহিলেন "এই রকম করেই তুমি যেন লোক জনকে খাওয়াও বাবা। আমি কেবল এই আশীর্ব্বাদ করি যে তুমি লক্ষপোষা হও। আর আমার মাথায় যত চুল এত তোমার পরমায়ু হ'ক। বাবা আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচিব না। নিজের শরীর নিজেই বুঝিতে পারিতেছি। আর আমার বাঁচিবার দরকারও নাই। সবই ত আমার হয়েছে। তোমার মুখ খানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মস্তে পেলেই হয়! আর বাবা, প্রফুল্লের বে টা দেখে যেতে পারিলে হ'ত।"

ই। ও যে ছেলে মানুষ, এই ত দশবছরে পড়েছে সবে।

জ্ঞা। তা হ'ক, দশ বছরে কি বে হতে নাই ? আজ কালই শুন্‌ছি ঐ সব কথা। সে কালে ত ছেলেবেলায় লোকের

বে হ'ত। অথচ সে কালের লোক খাট্‌তে পার্ত্ত বেশী, খেতে পার্ত্ত বেশী, বাঁচতও বেশী।

ই। তা দাও বে, তোমার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, আমি কি বারণ কর্বো? কনে পাবে কোথা?

জ্ঞা। শরতবাবুর না একটী ছোট মেয়ে আছে?

ই। তবে ত তুমি সম্বন্ধ ঠিকই করে রেখেছ। তারা বলিলেই দেবে এখন। মেয়েটীও যেন একবারে পুতুল টুকু।

জ্ঞানদার প্রস্তাবটী ইন্দুর কাছে যেন আকাশবাণী বলিয়া বোধ হইল।

জ্ঞানদা আবার বলিলেন বাবা, বেশ হবে এখন এই সম্বন্ধ। অন্য যায়গায় বে দিতে গেলে ওঁদের হয় ত টাকা লাগিত।

ই। তা ঠিক। আর আমার পক্ষে ওঁদের উপকার কি তাইতে কণামাত্রও শোধ হবে? জন্মেও ওঁদের গুণ ভুল্‌তে পারিব না।

জ্ঞা। তার আর কি কথা, বাবা?

ই। কামাখ্যা বাবু মরিবার সময় একটী পয়সাও রেখে যেতে পারেন নাই। যে দান, এমন দিন যায় নাই যে ওঁ বাড়ীতে লোকে অন্ন পায় নাই। শরতের কাল হতেই ওরা একবারে বসে গেছে। ছোট ভাই দুটীর এখনও চাকরি বাকরি কিছুই হয় নাই। আমি মাসে মাসে যে পঞ্চাশটী টাকা দি, তাতে যে কত আহ্লাদ! কামাখ্যাবাবুর স্ত্রী যেন আমার এক মা। এই যত দিন বাসায় ছিলাম, বলিতে পারি না যে এক দিন শরতকে আর আমাকে দুই ভেবেছেন। সংসারে যারা ভাল হয় তাদেরই কি মন্দ হয়?

জ্ঞানদা "ভগবানের ইচ্ছা—" বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। একটু বাদে বলিলেন "বাবা, ঐ যে দিচ্ছ ঐ কাজ। আহা! ওঁদের বোধ হয় আমার সমস্ত সংসারটা ধরে দিলেও ধার শোধ হয় না। সেই যে দশটী টাকা। এখন বোধ হয় কেউ দশলাক টাকা দিলেও তেমন খুসী হই না। হারে দিন—বাবা সেই দিনের কথা যেন চিরকাল মনে থাকে।"

ই। তা থাক্‌বে; জগদীশ—

জ্ঞা। যাক, বাবা—প্রফুল্লের বে টা হয়ে গেলে আমায় বৃন্দাবনে রেখে আসিবে?

ই। কেন?

জ্ঞা। আমি সেইখানে যেয়ে মরিব।

ই। তুমি আজ বারবার ঐ কথাটা বল্‌ছ কেন?

জ্ঞা। না বাবা, আমার আর দিন নাই।

ই। আচ্ছা তা হবে এখন—আমি যাই বামুণেরা অনেক-ক্ষণ বসে আছে।

প্রফুল্ল এতক্ষণ কেবল মুখটা নীচু করিয়া ঠাকুমার আঁচলের কোণটা পাকাইতেছিল। ইন্দু বাহির হইয়া যাইতেই জ্ঞানদা বলিলেন "প্রফুল্ল তোর বে হবে, বউ আস্‌বে, দুজনে একসঙ্গে আমার কাছে শুয়ে থাক্‌বি।

"যা" বলিয়া প্রফুল্ল জ্ঞানদার গায়ে একটী ধাক্কা মারিল। প্রফুল্ল ঠাকুরমাকে "যা" ভিন্ন যাও বলিতে এখনও অভ্যাস করে নাই।

জ্ঞানদা "যা কেন, দেখিস্‌ এই বছরের মধ্যেই তোর বে

দেব” বলিয়া প্রফুল্লের গালটী টিপিয়া দিলেন। মুখে হাসি বাহির হইল।

পাঠক! জ্ঞানদার মুখে কখনও কি হাসি দেখিয়াছেন?

সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

—oo—

জ্ঞানদার দেহত্যাগ।

"অতিবাদং ন প্রবদেন্নবাদয়েৎ, যো নাহতঃ প্রতিহন্যান্নঘাতয়েৎ।
হন্তুং চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ, তস্মৈ দেবাস্পৃহয়ন্ত্যাগতায়।"

শরতবাবুর কন্যার সহিত প্রফুল্লের বিবাহ হইয়াছে। জ্ঞানদার সাধ পূরিয়াছে। তিনি বৃন্দাবন যাইবেন। ইন্দু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলেন না। জ্ঞানদার মরিবার বয়স হয় নাই; কিন্তু তাঁহার কেমন মন টানিয়াছে। তিনি কিছুতেই দেশে থাকিবেন না। ইন্দু সপরিবারে তাঁহার সঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে রাখিয়া আসিবেন। দিন স্থির হইয়া গেল। যাইবার দিন গ্রামের অনেকেই জ্ঞানদার-সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিল। এক সময়ে এই জ্ঞানদা উপবাস করিয়া থাকিলেও কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই।

রামজয় ও গৌরহরি দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। রামজয়ের বংশে তাহার পুত্র পূর্ণচন্দ্র, আর গৌরহরির বংশধর রমানাথ আছেন। উভয়েরই অবস্থা শোচনীয়। গৌরহরি মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক দিন দুশ্চিকিৎস্য রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। জমিটুকু জমাটুকু যা ছিল, সেই সময়ের মধ্যে সমস্তই গিয়াছে। পূর্ণ-চন্দ্রেরও কিছুই নাই। পূর্ণ ছেলেবেলায় ইন্দুর সঙ্গে পড়িতেন। তাহার লেখাপড়া অতি সামান্যই হইয়াছিল। রমানাথ ইন্দুর বাড়ীতেই থাকেন। ষষ্ঠী শুভচণ্ডী পূজাটা করেন। লোকটা জনটা আসিলে না সময় মত দুটী রেঁধেও দিলেন। পূর্ণচন্দ্র চাকুরীর চেষ্টায় ফিরিতেছেন।

যাত্রা করিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জ্ঞানদা ইন্দুকে ডাকিয়া নির্জ্জনে বলিলেন "বাবা, পাছে ওদের ছেলেদের কখনও মন্দ ভাব। ওদের বাপ যা'করে গেছে তা পাছে কখনও মনে কর। তাদের কাঁধে ভূত চেপেছিল। তা নইলে মানুষে কখনও অমন ব্যবহার করে কি? ওদের সৌদামিনীর বিবাহের রাত্রের কথা—সে দুঃখ—আমি শ্মশানে গেলেও বোধ হয় ভুলিতে পারিব না।" জ্ঞানদা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিলেন।

ইন্দুও কাঁদিলেন। তাঁহারও সেই রাত্রির কথা মনে পড়িল। সে দিন যেমন বলেছিলেন আজিও মনে মনে তেমনি বলিলেন "কাকীমা, তুমি মানুষ নও, দেবী।"

জ্ঞানদা বৃন্দাবন গেলেন। ইন্দু ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহাকে বলিলেন "বাবা, যদি আমি আরও কিছু দিন বাঁচি তবে বছর বছর পূজার পর এসে আমাকে দেখে যাবে।

আর এক পূজাও কিন্তু পার হইল না। ছমাস না যাইতেই

ইন্দু জ্ঞানদার এক চিটি পাইলেন। "ইন্দু, আমার বোধ হয় সময় হইয়া আসিয়াছে। আজি তিন দিন জ্বর হইয়াছে। তুমি বউমাকে, প্রফুল্লকে, তার ভাই বোনকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। পার ত প্রফুল্লের বউটীকে নিয়ে এস।"

পত্র পাইবার পর দিনই ইন্দু সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রফুল্লের বালিকা স্ত্রীও সঙ্গে গেল। ইন্দু যাইয়া দেখেন সেই দেবী মূর্ত্তি একখানি ছোট জলচৌকির উপর বসিয়া একটী হরিনামের মালা হাতে করিয়া সুমধুর হরি বোল, হরি বোল শব্দ করিতেছেন। ইন্দু হইতে ছোট ছেলেটী পর্য্যন্ত সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানদার আজি বার দিন হইল জ্বর হইয়াছে। কিন্তু ইচ্ছামত তিনি স্নানও করেন, ভাতও খান।

ইন্দু যাইয়াই একজন কবিরাজ ডাকাইলেন। জ্ঞানদা কহিলেন, "এ জ্বরে আবার কবিরাজ কেন ?"

ইন্দুর স্ত্রী বিমলা প্রাণপণে শ্বাশুড়ীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। জ্ঞানদার ন্যায় রমণীর সংসর্গে থাকিলে ইতর স্ত্রীলোকও ভদ্র হয়। বিমলা ত ভদ্রঘরের মেয়ে।

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে জ্ঞানদা মালাটী জপিয়া প্রফুল্লকে ডাকিতেছেন "প্রফুল্ল এদিকে আয় দাদা, মালাটা তোর মাথায় ছোঁয়াইয়া তুলে রাখি।"

ইন্দু নিকটে ছিলেন। বলিলেন "কাকীমা আর সব ছেলে মেয়ে গুল কি তোমার নাতি নাত্‌নি নয় ? কেবল ওর একার কপালেই মালা ছোঁয়াবে ? ওকেই যত আশীর্ব্বাদ কর্‌বে ?"

জ্ঞা। না বাবা, সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিব। ওর উপর

আমার অত টান কেন জান ও যে আমার শ্বশুরকুলের জলপিণ্ডের আশা প্রথমেই সফল করে।

ইন্দু আর কিছু বলিলেন না। একটু বাদে জ্ঞা[illegible] কহিলেন “বাবা তোমায় আর বেশী কি বলে যাব? [illegible] বুদ্ধি ভগবান দিয়েছেন, চিরকাল সুখে থাকিবে। বাবা, টাকা কিছু কিছু সঞ্চয় রেখো। অর্থ না থাকিলে মানুষের কি কষ্ট হয়, তাত জান্‌তে বাকি নাই। তোমার ছেলে পুলে যেন আর পয়সার জন্যে ক্লেশ না পায়।”

ই। কাকীমা, আমার মন ত জান। নিজের জন্যে আমি কত কম খরচ করি। যা নইলে নয় তা ভিন্ন কিছু কিনি না। কিন্তু পরের দুঃখ দেখিলেই বুক ফেটে যায়।

জ্ঞা। ও তোমাদের বংশের ধারা, তা কি আমি বারণ কচ্ছি? গরীবকে দেবার চেয়ে আর কাজ নাই। আর নিজের জন্যে তুমি কিছু করনা কেন বাবা? নিজে পয়সা আন্‌ছ, নিজে করিবে না ত কে করে দেবে?

ই। তা আমার ইচ্ছা হয় না। না করেছি একখানা ভাল শাল, না আছে একটী হীরার আংটী। কি হবে?

ইহার পরদিনই জ্ঞানদা জোর করিয়া একখানি উৎকৃষ্ট কাশ্মীরি শাল আর একটী মূল্যবান হীরকাঙ্গুরীয় ইন্দুর জন্যে ক্রয় করিলেন। কহিলেন, “বাবা, একবার আংটীটা পর, শালখানি গায়ে দাও, আমি দেখি।”

কাকীমার আদেশ প্রতিপালনার্থে ইন্দু দিনের বেলায় ঘরের ভিতরে শালখানি খুলিয়া গায়ে দিলেন; অঙ্গুরীয়কটী হাতে পরিলেন। বাহিরে প্রবীণ হইলেও জ্ঞানদার কাছে ইন্দু আজিও ছেলে মানুষ।